শিবরাত্রি
মহামিলনের রাত্রি
— পৃঃ ৩১

স্বস্তিকা

মূল্য : ষোলো টাকা
৭৮ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা।। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
৩ ফাল্গুন, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭
website : www.eswastika.com

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৬ ফেব্রুয়ারি - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

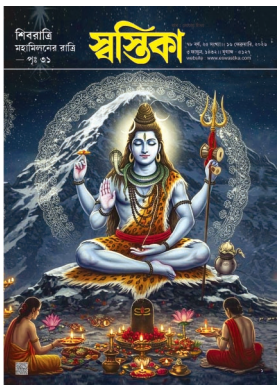

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

উৎপাদনহীন জনমোহিনী রাজনীতি আর আদালতকে নাট্যমেলা বানানোর কদর্য খেলা ঃ 'খেলা ভাঙার খেলা'

☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

মদ ছাড়া গতি নেই ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

পশ্চিমবঙ্গে খারেজি মাদ্রাসা জেহাদি তৈরির অঁতুরঘর

☐ অরুণ চক্রবর্তী ☐ ৮

বিচারবিভাগীয় সংস্কার ছাড়া 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন অধরা থেকে যেতে পারে ☐ কৌটিল্য ☐ ১০

নিয়ন্ত্রণের কূটনীতি ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন 'বন্ধুত্ব' এবং বৈশ্বিক দেশভাঙনের ধারাবাহিকতা

☐ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ১১

তৃতীয় বিশ্ব থেকে তৃতীয় মেরু 'মাদার অফ অল ডিলস্' স্বাক্ষর হলো ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ১৩

সহিষ্ণুতা হতে হবে সবার, একার নয় ☐ অজয় ভট্টাচার্য ☐ ১৬

সিপিআই(এম) গণতন্ত্রের বুলি আওড়ায়, অথচ ওরাই আমায় পঙ্গু করে দিয়েছে ঃ সদানন্দন মাস্টার

☐ প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য ☐ ১৭

শিবরাত্রি — মহামিলনের রাত্রি ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

লুপ্ততীর্থ পুনরুদ্ধার তীর্থক্ষেত্র ত্রিবেণী ☐ পল্লব মণ্ডল ☐ ৩৪

শিবচতুর্দশী বা মহাশিবরাত্রির মাহাত্ম্য

☐ কানু রঞ্জন দেবনাথ ☐ ৩৫

শিবময় ভারত ☐ শুভদীপ দাস ☐ ৩৭

শিবত্ব লাভই ভারতের সাধনা ☐ ড. রামানুজ গোস্বামী ☐ ৪৩

দলে দলে মাওবাদী আত্মসমর্পণ করছে ☐ দুর্গাপদ ঘোষ ☐ ৪৫

উচ্চশিক্ষা যখন বেকারত্বের শংসাপত্র ঃ পশ্চিমবঙ্গের তরুণ প্রজন্মের অন্তহীন রক্তক্ষরণ ☐ সোমনাথ গোস্বামী ☐ ৪৮

গল্পকথায় ডাক্তারজী ☐ সংকলক— বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐

প্রকাশিত হবে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ঋতু পরিবর্তনের সাবধানতা

ছয় ঋতু— প্রতিটি ঋতু পরিবর্তনশীল। ঋতু পরিবর্তনে ঘটে আবহাওয়ার পরিবতন, আর তার প্রভাব পড়ে মানব শরীরেও। দেখা দেয় নানা ধরনের অসুখবিসুখ। অবলম্বন করতে হয় বিভিন্ন ধরনের সাবধানতা। বর্তমানে আমরা শীত থেকে বসন্ত ঋতুতে প্রবেশ করছি। শুরু হয়েছে আবহাওয়ার পরিবর্তন। এই সময় সুস্থ থাকতে আমরা কি করবো কি করবো না তাই নিয়েই স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় লিখবেন কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০/ টাকা (মোট ২৮০০/) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০/ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতবাসীর উপাস্য সর্বত্যাগী উমানাথ

ভারতবর্ষ সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসক। সত্য ও সুন্দরের মাঝে শিবের উপস্থিতি ভারতবর্ষকে মঙ্গলময় ও কল্যাণময় করিয়াছে। তাই সমগ্র বিশ্ব ভারতীয় সংস্কৃতিকে সভ্যতার জননী বলিয়া মনে করিয়াছে। এই কথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মনীষী অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে উপাসনার স্বাধীনতা রহিলেও হিন্দু সমাজ প্রধানত পঞ্চদেবতা— শিব, শক্তি, সূর্য, গণপতি ও বিষ্ণুর পূজা করিয়াছে। শ্রীবিষ্ণু ও মহাদেব শিবশঙ্করের উপাসনা মূর্ত অথবা অমূর্ত দুইভাবেই করা হইয়া থাকে। বিষ্ণুপূজা শালগ্রাম শিলায় এবং শিবপূজা লিঙ্গরূপে করিবার প্রথা রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে ভগবান শিব হইলেন ত্রিমূর্তির অন্যতম। তিনি দেবাদিদেব মহাদেব অর্থাৎ সর্বোচ্চ দেবতা হিসাবে পরিচিত। শৈবমতে তিনিই পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। তাঁর প্রধান প্রকাশ হইল লিঙ্গরূপ, যাহা নিরাকার ব্রহ্মের প্রতীক। তিনি একাধারে শান্ত, মঙ্গলময়, করুণাময় আবার অন্যদিকে সংহারকারী রুদ্র। ভগবান শিব বেদবহির্ভূত দেবতা নহেন। ভাগবত পুরাণ অনুসারে মহাদেব শিব শ্রীবিষ্ণুরই রুদ্র রূপ। ঋগ্বেদে রুদ্রকে মরুৎগণের পিতা বলা হইয়াছে। যজুর্বেদের নানা স্থানে রুদ্রকে শিব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কোনো কোনো তথাকথিত পণ্ডিত অভিসন্ধিমূলকভাবে শিবকে অনার্যদের দেবতা বলিয়াছেন। আর্য-অনার্যের কূটকচালির বহু পূর্বেই ভারতবাসী ভগবান শিবকে ঘরের দেবতা করিয়া লইয়াছে, একান্ত আপনার বলিয়া মনে করিয়াছে। সমগ্র ভারতীয় সমাজ, তাহা নগরবাসী-গ্রামবাসী, গিরিবাসী-বনবাসী, জনজাতি-উপজাতি সকলেই শিবকে তাহাদের প্রাণের দেবতা রূপে আরাধনা করিতেছে। শুধু ভারতীয় উপমহাদেশে নহে, বিশ্বের বহু দেশে শিব সাধনার নিদর্শন মিলিয়াছে। তাই তো স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ওই বৃদ্ধ শিব ষাঁড়ে আরোহণ করিয়া একদিকে সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলেবিস, এমনকী অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার কিনারা পর্যন্ত ডমরু বাজাইয়া এককালে ভ্রমণ করিয়াছেন; আবার তিব্বত, চীন, জাপান ও সাইবেরিয়া পর্যন্ত ষাঁড়ে আরোহণ করিয়াই ভ্রমণ করিয়াছেন, অদ্যাবধি করিতেছেন। অর্থাৎ হিন্দু সংস্কৃতির বিশ্বসঞ্চার ঘটাইয়াছেন ভগবান শিব। বস্তুত, হিন্দু সমাজ শিব সাধনা করিতে করিতে শিবস্বরূপ হইয়াছে। আর তাহার কারণেই উচ্চকোটির সংস্কৃতিবান ও কল্যাণকারী জাতি হিসাবে হিন্দু জাতি সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে লোককল্যাণের নিমিত্ত যাঁহারা নিবেদিত, তাঁহাদিগকে রুদ্রাবতার অথবা শিবাবতার জ্ঞান করা হইয়া থাকে। বৌদ্ধ সাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদ্বান ড. সি এস উপাসক মনে করেন স্বয়ং ভগবান শিব বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্ববাসীকে শান্তির বাণী বিতরণ করিয়াছেন। আদি শঙ্করাচার্য, ত্রৈলঙ্গ স্বামী মহারাজ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ, যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় প্রমুখ মহাপুরুষ শিবাবতার বা শিবকল্পপুরুষ হিসাবে সমগ্র জীবন মানব কল্যাণেই উৎসর্গ করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে তাহাদের উপাস্য হইলেন সর্বত্যাগী উমানাথ শঙ্কর। এই শঙ্কর তথা শিবপূজা সর্বত্র লিঙ্গরূপেই হইয়া থাকে। লিঙ্গ হইল মহাপ্রতীক। লিঙ্গপুরাণে এই সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা রহিয়াছে। শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে যে, শিবলিঙ্গ মহাদেবের অসীম, অনাদি ও অনন্ত রূপের প্রতীক। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে বিশ্বজননীর মহাশক্তির প্রতীক। ইহা মানব জাতিকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহা সত্ত্বেও হিন্দু সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞানীরা অর্বাচীনের ন্যায় কটূক্তি করিতে দ্বিধা করে না। তথাকথিত এক রাজনৈতিক নেত্রী শিবলিঙ্গ সম্পর্কে কটূক্তি করিয়া শিবভক্তদিগের ভাবাবেগে আঘাত করিয়াছিলেন। লিঙ্গপূজা কুসংস্কার, অনার্য সভ্যতার যৌন প্রতীক, শোষণমূলক সামন্তবাদী চেতনার প্রতিভূ ইত্যাদি বলিয়া বহু বৎসর কমিউনিস্টরা মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ভারতীয় মনন হইতে শিবভক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস করিতে পারে নাই। কেননা শিবঠাকুরের আপন দেশ ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে শিব এক অবিচ্ছেদ্য সত্তা। ভারতবাসীর হৃদয় হইতে তাঁহাকে ম্লান করিবে সাধ্য কাহার?

সুভাষিতম্

শান্তিতুল্যং তপো নাস্তি তোষান্ন পরমং সুখং।
নাস্তি তৃষ্ণাপরো ব্যাধির্ন চ ধর্মো দয়াপরঃ।।

অর্থ ঃ শান্তির তুল্য কোনো তপস্যা নেই, সব সময় আনন্দে থাকার মতো কোনো সুখ নেই, কামনা-বাসনার তুল্য কোনো ব্যাধি নেই এবং দয়ার মতো কোনো ধর্ম নেই।

উৎপাদনহীন জনমোহিনী রাজনীতি আর আদালতকে নাট্যশালা বানানোর কদর্য খেলা

‘খেলা ভাঙার খেলা’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায় দু’ভাগ হয়ে গিয়েছে। একে অন্যকে তেজপাতা বলে ডাকছে। তেজপাতারা তৃণমূলনেত্রীপন্থী। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত মুসলমান নেতা হুমায়ুন কবির কথাটা চালু করেছে। রান্নাতে তেজপাতা ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীও মুসলমানদের ভোটের এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে ফেলে দেন। এই আকছা-আকছির ফলে প্রায় ২২ শতাংশ মুসলমান ভোটের ৩০ শতাংশ তৃণমূলের পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। যেমনটা ঘটেছে ৫০ শতাংশের মধ্যে ২৭ শতাংশ মহিলা ভোটের ক্ষেত্রে। কর্মসংস্থানের পরিবর্তে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সামান্য ভাতায় তাদের সব সাংসারিক খরচ সংকুলান হচ্ছে না। কয়েকটি সমীক্ষা জানাচ্ছে যে, আসন্ন রাজ্য ভোটে তৃণমূল ৫৪ শতাংশের বেশি মুসলমান ভোট পাবে না। ২০২১ সালে রাজ্যের মুসলমান ভোটের প্রায় ৯৫ শতাংশ পায় তৃণমূল। ওয়াকফ সম্পত্তি আর সরকারি চাকরিতে ওবিসি সংরক্ষণ ঘিরে তৃণমূলনেত্রী মুসলমানদের বিরাগভাজন হয়েছেন। ২০১১ সালে বিদেশি সিপিএমের থেকেও মুসলমান ভোট সরে গিয়েছিল।

এই মুহূর্তে রাজ্যের প্রতিটি মানুষের মাথায় ৭৭ হাজার টাকার দেনা। ২০১১ সালে এই রাজ্যের মানুষের মাথা পিছু দেনার পরিমাণ ছিল ২২ হাজার টাকা। ‘ডি-ফ্যাক্টো’ কথাটির অর্থ বাস্তবে (ইন প্র্যাকটিস বা ইন ফ্যাক্ট) বা কার্যত যা সত্য। এই বিষয়টি প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী নির্ধারিত, আইনগত বা বিধিসম্মতভাবে নয়। ফাইল ছিনতাই থেকে ভরা আদালতে মিথ্যা-বলা নেত্রীকে একসময় এভাবেই দেখা হতো। সে ধারণা রাজ্যে জোরদার হয়েছে। ভোটারকে ধোঁকা দিয়ে কীভাবে নেতা হওয়া যায়— ১৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সেটাই বরাত হয়ে গিয়েছে। এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই সুপ্রিম আদালতে দু’টি বিষয় নির্ধারিত হয়ে যাবে। এ রাজ্যে এসআইআর-এর ভবিষ্যৎ আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জনপ্রতিনিধি হিসেবে কতটা বৈধভাবে কাজ করেন। তিনি আদৌ নৈতিক ব্যক্তি কি না। এই দু’টি রায়ের ওপর নির্ভর করছে ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। এখন মুখ্যমন্ত্রীর মনে বিস্তর ভয়! ২০২১-এর মতো ২০২৬-এর ভোটে তার চয়নিত বিধানসভা আসনে তিনি আবার হেরে না যান। ২০২১ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি এ রাজ্যের ‘ডেজ্যুরে’ বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তার আগে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিজেপির কোনো স্বীকৃতি ছিল না। তবে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়ে প্রথমবার ক্ষমতা দখল করতে না পারলেও নন্দীগ্রাম আসনে তৃণমূলনেত্রীকে তারা হারিয়ে দেয়। তৃণমূলনেত্রীর কাছে তা অত্যন্ত লজ্জার! শোনা যাচ্ছে যে, এবার এক দফায় ভোট হতে পারে। মানসিক চিকিৎসকরা বলেন, অপ্রকৃতিস্থ ভাবনার প্রথম প্রকাশ নেতিবাচক চিন্তা। যে কোনোভাবে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা। এসআইআর-এর ধাক্কায় ২০২৫-এর ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর ভবানীপুর কেন্দ্রে প্রায় ৪০ হাজার ভুয়ো ভোটার বাদ পড়েছে। পুরো এসআইআর প্রক্রিয়া শেষের পর আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ফাইনাল লিস্ট বা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হলে আরও বাদ যাবে।

১৯৮৯-তে সিপিএমের কাছে তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী হেরেছিলেন রাজ্যের বিরোধী নেত্রী হয়ে। তিন দশক পরে বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হারেন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে। সে ভয় তৃণমূলনেত্রী এখনও কাটাতে পারেননি। তার উদাহরণ গত ৪ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম আদালতে তার অস্থির ও আতঙ্কিত অবস্থান আর অবিশ্রান্ত ভুল ইংরেজির সঙ্গে অনৃত ভাষণ। তার বোকা সমর্থককুল তাতেই বাহবা দিয়েছে। আদালত তার একটি দাবিও মানেনি। হারের দুঃস্বপ্ন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সর্বদা তাড়া করে বেড়ায়। ২০২৬-এর ভোটে সে ভয় তাকে পুনরায় ঘিরে ধরেছে। নন্দীগ্রামে হারের পর দ্বিতীয় দফায়, উপনির্বাচনে ভবানীপুরের ১০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৭টি-তে হেরে যান মুখ্যমন্ত্রী। বাকি তিনটি ওয়ার্ডে তাঁর দুধেল গাইরা বেশি বেশি করে ভোট দিয়ে তাকে জিতিয়ে আনে। শুভেন্দুবাবু তাঁকে ‘কম্পার্টমেন্টালে পাশ মুখ্যমন্ত্রী’ বলে ডাকেন। কারও দাবি তিনি ভবানীপুরের ‘ডি-ফ্যাক্টো’ মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের নয়। ২০১১-তে বিদেশি সিপিএমের প্রতি পশ্চিমবঙ্গবাসীর তীব্র বিতৃষ্ণার কারণে ফাঁকতালে নেগেটিভ ভোটে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হন তৃণমূলনেত্রী। যুক্তফ্রন্টের সময় যেমন ফাঁকতালে নেতা হয়েছিলেন অজয় মুখার্জি, জ্যোতি বসুরা। তৃণমূলনেত্রী হলেন কংগ্রেসের উচ্ছিষ্ট আর সিপিএমের ‘হ য ব র ল’ রাজনীতির ফসল। আসন্ন ভোটে বিজেপির লক্ষ্য হলো হিন্দু ঐক্য। রাজ্যের বৃহত্তর হিন্দুসমাজ সে দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। তৃণমূলনেত্রীর দলে ভাঙন অনিবার্য। মুসলমান, লুম্পেন-সহ মহিলা ভোটের কিয়দংশ নিয়েই তৃণমূলনেত্রীর ভোটব্যাংক। সে ভোট সরছে। পথের নেত্রী হিসেবেই তার উত্থান। তবে বিশ বছর আগের আন্দোলনের কায়দা এখন বাতিল হয়ে গিয়েছে। প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা দেনার উৎপাদনহীন, মিথ্যা জনমুখী রাজনীতির জাল বুনে রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। তাতে রাজ্যের মুখ পুড়েছে তাই নয়, বাঙ্গালি জাতিরও মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। সে মাথা তোলার সময় হয়েছে। বিজেপির হাত ধরে তা হয় কি না সেটাই দেখার।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

মদ ছাড়া গতি নেই দিদির

সুন্দর মৌলিক

ঋণে ঋণ বাড়ে। কিন্তু আপনাকে দেখে আমি বুঝি ঋণে ভোট বাড়ে। বাঙ্গালি জাতটাকে আপনার মতো কেউ চেনে না দিদি। এটা আমি বলে রাখলাম। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা করে বাড়ানো হলো উপভোক্তাদর জন্য। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই কার্যকর হবে এই ঘোষণা। এটা শুনে সবাই নাচতে শুরু করছে না। কিন্তু দিদি দেখুন কেউই ভাবছে না, কোথা থেকে এত টাকা দেবে! প্রচুর টাকা ধার করতে হবে এখনই। কারণ, বকেয়া ডিএ-র জন্য এখনই, এখনই চাই ১০ হাজার কোটি টাকা। কোনো উপায় নেই।

আমি জানি দিদি আপনি কী ভাবছেন। সেটা হলো, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হবেই। সে যেভাবেই হোক। তাতে অন্য খাতের টাকা কাটতে হলে হবে। কিন্তু দিদি আপনার সরকারের পকেটের যা অবস্থা তাতে ডিএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সব নির্দেশ মানা যাবে কি? আমার তো সন্দেহ রয়েছে। বরং দিদি ভোটে হেরে যাওয়াই মঙ্গল। এই রে, কী বলে ফেললাম আমি! বালাই ষাট, আপনি হারতে যাবেন কেন, বরং রাজ্য হেরে যাক!

আদালত বলছে, ৬ মার্চের মধ্যে ২৫ শতাংশের প্রথম কিস্তি মেটাতে হবে এবং আগামী মে মাসের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র সবটা দিয়ে দিতে হবে। শীর্ষ আদালত পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, এখনই বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা তথা ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে হবে রাজ্যকে। শুধু বর্তমানে কর্মরত রাজ্য সরকারি কর্মচারীই নয়, ২০১৯ সালের পর যাঁরা অবসর নিয়েছেন, তাঁদেরও ২০০৯ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ডিএ বাবদ বকেয়া মিটিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে পেনশনভোগীদেরও একটা বড়ো অংশ ডিএ বাবদ বকেয়া টাকা পাবেন। উপকৃত হবে ১২ লক্ষ পরিবার। এখনই যেটা দিতে হবে সেই ২৫ শতাংশের অঙ্কই দাঁড়ায় প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার মতো। এর পরে বাকি ৭৫ শতাংশও দিতে হবে। মোট ১০০ শতাংশ ডিএ দিতেই হবে। বাকি ৭৫ শতাংশের প্রথম কিস্তির টাকা মার্চ মাসের ৬ তারিখের মধ্যে দিতে হবে। বাকিটা কবে কবে, কত কিস্তিতে দেওয়া হবে তা ৩১ মার্চের মধ্যে ঠিক করে ফেলতে হবে। ১৫ মে'র মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে সুপ্রিম কোর্টকে। এর জন্য কমিটিও তৈরি করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

বকেয়া ডিএ ৩১ মার্চের মধ্যে দিতে হবে যেটা করতে গেলে বর্তমান বছরের টাকা থেকে করতে হবে। মানে টাকা দিতে হলে এখনই কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে ঋণ নিতে হবে। সেই ঋণ নেওয়ার মতো অবস্থা তো সরকারের নেই। যতটা ঋণ নেওয়া সম্ভব সেটা তো আপনি আগেই নিয়ে নিয়েছেন।

দিদি, আমি সবটা মনে রেখেছি বলুন! আসলে আপনার বিপদের কথাগুলো আমার মনে থেকে যায়। গড়গড় করে লিখে ফেললাম। কিন্তু দিদি, গত বছর ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ রাজ্যকে বকেয়া ডিএ-র ৫০ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টে তখন আপনার আইনজীবী কী যেন একটা বলেছিলেন— 'রাজ্যের ব্যাকটা ভেঙে যাবে।' সবাই এর মানে খারাপ মনে করেছিল। আমি বাবা ওসবে নেই! কিন্তু এখন কী হবে দিদি, কিছু ভেঙে যাবে না তো!

তাছাড়া দিদি, আগামী বছরে বাজেটের টাকায় তো আর সেটা দেওয়া যাবে না। কারণ, ভোটের আগে যে বাজেট সেটা তো সম্পূর্ণ বাজেট নয়। ভোট অন অ্যাকাউন্ট। আর এই যে বকেয়া ডিএ ৩১ মার্চের মধ্যে দিতে হবে যেটা করতে গেলে বর্তমান বছরের টাকা থেকে করতে হবে। মানে টাকা দিতে হলে এখনই কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে ঋণ নিতে হবে। সেই ঋণ নেওয়ার মতো অবস্থা তো সরকারের নেই। যতটা ঋণ নেওয়া সম্ভব সেটা তো আপনি আগেই নিয়ে নিয়েছেন।

আমি বলি কী, মদ খাওয়ার ব্যাপক প্রচলন করুন। দেখুন চলতি বছরেই ২২ হাজার কোটি টাকার বেশি লাভ হয়েছে আবগারি থেকে। আগামী বছরে আপনি ২৪ হাজার কোটি টাকার টার্গেট নিয়েছেন। কিন্তু এখন যদি জোর কদমে মদ খাওয়া বাড়িয়ে দেওয়া যায় রাজ্যের মানুষের, তবেই ঋণ না করে কিছুটা ম্যানেজ করতে পারবেন। তাতে অবশ্য নারীদের ওপর মদ্যপ পিতা বা স্বামীর অত্যাচার বেড়ে যেতে পারে। তখন না হয় আপনি বলে দবেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছো, একটু মারধোর খেয়েই নাও না। নিজেরই তো বাবা বা স্বামী।

□

পশ্চিমবঙ্গে খারেজি মাদ্রাসা জেহাদি তৈরির কারখানা

পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে মুসলমান ভোট একটি বড়ো ফ্যাক্টর। সিপিএম দীর্ঘদিন এই ভোট ধরে রেখেছিল। তারাই ভোটব্যাংক রাজনীতির পথপ্রদর্শক। বর্তমান শাসক দল একই সর্বনাশা খেলায় মেতেছে।

অরুণ চক্রবর্তী

খারেজি মাদ্রাসা বলতে বোঝায় সেইসব ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলি রাজ্য মাদ্রাসা বোর্ডের অধীন নয়, যেগুলির কোনো নির্দিষ্ট সিলেবাস অনুমোদন নেই, যেগুলির শিক্ষক নিয়োগ, অর্থায়ন ও পাঠ্যবস্তু সরকারের নজরদারির বাইরে, যেগুলির ছাত্রদের মূল ধারার শিক্ষার সঙ্গে কোনোরকম সংযোগ নেই। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান কার্যত দেশে একটি সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করে, যা সংবিধান স্বীকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে।

এগুলিতে শিক্ষাদান নয়, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার চেষ্টা থাকে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো সুনাগরিক তৈরি করা, যুক্তিবাদী মন তৈরি করা, বহুত্ববোধের মানসিকতা তৈরি করা, সর্বোপরি দেশের প্রতি মমত্বের ভাব নির্মাণ করা। কিন্তু খারেজি মাদ্রাসায় ইতিহাসের আধুনিক পাঠ নেই, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ অনুপস্থিত, সংবিধান, গণতন্ত্র, নারী সম্মান ও নারীঅধিকার শেখানো হয় না। ফলত তার পড়ুয়াদের মধ্যে 'আমরা-ওরা'-র মানসিকতা তৈরি হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই এরা ধীরে ধীরে মূল সমাজ থেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর এই বিচ্ছিন্নতাই সন্ত্রাসবাদী ও জেহাদি তৈরি হওয়ার প্রথম ধাপ।

অনিয়ন্ত্রিত পাঠ্যবিষয় পড়ানো হয় এখানে। কিন্তু সরকারি স্কুলে বই থাকে সরকার অনুমোদিত। দেশ-বিদেশের গৌরবময় ইতিহাস পড়ানো হয়, ধর্মীয় পাঠ থাকে সীমিত। কিন্তু খারেজি মাদ্রাসায় দেওয়া হয় কেবলমাত্র একপাক্ষিক মজহবি পাঠ। দেওয়া হয় মধ্যযুগীয় ফিকহ ও শরিয়তি আইনকেই প্রাধান্য এবং হিন্দুধর্ম বা অন্য মত, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রতি অসহিষ্ণুতার শিক্ষা। এখানে তাদের মজহবের একমাত্রিক ও প্রশ্নহীন ব্যাখ্যা করা হয়। প্রশ্ন যেখানে নিষিদ্ধ সেখানে সন্ত্রাসবাদ সহজেই ঢুকে পড়ে। অর্থায়নের অস্বচ্ছতা এবং বিদেশি প্রভাবের বাড়বাড়ন্ত এই মাদ্রাসাগুলিকে গ্রাস করে। এদের অর্থ কোথা থেকে আসে, তার কোনো হিসাব থাকে না, থাকে না স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি স্বীকৃত সত্য হলো, যে শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে তা দেশের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিস্বরূপ। বিশ্বের বহু দেশে (ইন্দোনেশিয়া, মিশর, ফ্রান্স প্রভৃতি) এই কারণে অনিয়ন্ত্রিত মজহবি শিক্ষার ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আনা হয়েছে।

খারেজি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করা ছাত্ররা সরকার-স্বীকৃত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না, আধুনিক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে তাদের হতাশা সৃষ্টি হয়। আর এই হতাশার সুযোগ নিয়ে খুব সহজেই তাদের দেশের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা যায়। তাদের বোঝানো হয়, তোমাদের দুঃখের কারণ এই দেশ, এই দেশের সরকার, এই দেশের গরিষ্ঠাংশ হিন্দু সমাজ। তার ফলে খুব সহজেই তারা দেশ ও হিন্দু বিরোধী হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে এই পরিস্থিতি আরও জটিল। কারণ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশ, রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশ এবং ভোটব্যাংকের রাজনীতি। এই প্রেক্ষাপটে খারেজি মাদ্রাসাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ না করার রাজনৈতিক প্রবণতা এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা, যা 'ধর্মীয় সংবেদনশীলতা'র অজুহাত মাত্র। এর ফলে ভোটভিখারি, সেকুলার রাজনৈতিক দল বা সরকার চোখ বন্ধ করে রাখে। এর বড়ো উদাহরণ, বাম জমানায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসাগুলিকে সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর বলেও দলের চাপে পড়ে ঢোক গিলেছিলেন। সম্প্রতি একই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন বিজেপির বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পল। তাতে রাজ্যের শাসক দলের আঁতে ঘা লেগেছে।

ভারতের সংবিধানে সেকুলার শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে কিন্তু সেকুলার দেশে মজহবি শিক্ষা কি গ্রহণযোগ্য? ভারতের সংবিধানে নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু শিক্ষা ও আইন তো দেশের সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এখানে প্রশ্ন হলো, যদি কোনো গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা চালায় যা দেশের পাঠ্যক্রম, সংবিধান এবং নাগরিক চেতনার বাইরে, তবে কি তথাকথিত সেকুলার দেশে তা যুক্তিযুক্ত? ফ্রান্স, জার্মানি, এমনকী বহু ইসলামি দেশেও মাদ্রাসা শিক্ষায় নিয়ন্ত্রণ আনা হয়েছে, সংস্কার সাধন করা হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, যে মাদ্রাসা সংস্কার মানবে না, দেশের আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে।

পশ্চিমবঙ্গের খারেজি মাদ্রাসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এইসব ঝুঁকি বাস্তব, তা কোনোভাবেই উপেক্ষণীয় নয়। সরকার যদি সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে ভবিষ্যতে এর মূল্য চোকাতে হবে সমগ্র দেশকে, দেশের নিরাপত্তাকে। তখন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্লোগানেই থেকে যাবে। মালদা-মুর্শিদাবাদ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের ঘটনা তা প্রমাণ করছে। বিলম্ব হলে জাতি আর একবার দেশ বিভাজনের সম্মুখীন হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভোটব্যাংকের রাজনীতির লালসায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবার রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি

শুধুমাত্র মাদ্রাসা খাতে বরাদ্দ করেছেন, তা রাজ্যের কল্যাণের জন্য সাধারণ প্রশাসনিক বার্তা নয়; এটি নির্ভেজাল ভোটব্যাংকের রাজনীতি। ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বাস্তবতা অত্যন্ত স্পষ্ট। রাজ্য ঋণগ্রস্ত, শিল্প বিনিয়োগে পিছিয়ে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিকাঠামো দুর্বল, বেকারত্ব উদ্বেগজনক, আর এই প্রেক্ষাপটে রাজ্যবাসী এই সত্যটি অনুধাবন না করতে পারলে এর ভয়াবহ পরিণামের সাক্ষী হতে বেশি দিনের প্রয়োজন হবে না।

প্রশ্ন উঠেছে, মাদ্রাসা খাতে এই বিপুল অর্থ বরাদ্দ কি রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে নাকি শিল্প, স্বাস্থ্য, সাধারণ শিক্ষা ও কর্মসংস্থান খাতকে বঞ্চিত করে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আনুগত্য ধরে রাখার প্রয়াস? এই বরাদ্দ উন্নয়নের ভারসাম্য ভেঙেছে এবং এটি নির্ভেজাল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বাজেট কোনো দানপত্র নয়। রাজ্য বাজেট হলো রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের ঘোষণা। কিন্তু রাজ্য সরকার যখন শিল্প বা স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় সীমিত বৃদ্ধি, স্কুল-কলেজে শিক্ষক ঘাটতি, সরকারি হাসপাতালের বেহাল দশা, তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মাদ্রাসা খাতে পাঁচ হাজার কোটির বেশি বরাদ্দ করে, তখনই প্রশ্ন ওঠে, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে কোন পথে নিয়ে চলেছেন?

রাজ্যের সাধারণ শিক্ষা বনাম মাদ্রাসা শিক্ষা— এ এক বৈষম্যের চিত্র। রাজ্যে আজ হাজার হাজার স্কুলে শিক্ষক নেই, ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত শিক্ষকের ঘাটতি, কলেজে ল্যাব নেই, অথচ মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগে বিশেষ ছাড়, অবসরভাতা ও ভাতা বৃদ্ধি, পরিকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার— তাই প্রশ্ন উঠেছে, একই রাজ্যে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য দুই রকম সরকারি আচরণ কি ন্যায়সঙ্গত? এটি বৈষম্যকেই প্রকট করছে না কি?

এটি শিল্প ও কর্মসংস্থানের দিক থেকেও ক্ষতি, যেখানে রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা চাকরিহীনতা। শিল্প এলেই চাকরি বাড়ে, রাজস্ব বাড়ে, তারফলে দারিদ্র্য কমে। মাদ্রাসা খাতে বরাদ্দ এই পাঁচ হাজার কোটি টাকা শিল্পপার্ক, MSME সহায়তা, স্টার্টআপ ফান্ড, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, এইসব খাতে গেলে হাজার হাজার চাকরি তৈরি হতে পারত। মাদ্রাসা খাতে এই অর্থ বরাদ্দ উৎপাদলশীলতা বৃদ্ধি করে না, রাজস্ব সৃষ্টি করে না, কর্মসংস্থানের বহুমুখী সুযোগ করে দেয় না। অর্থাৎ এটি ভোগভিত্তিক ব্যয়; উন্নয়নভিত্তিক বিনিয়োগ নয়। স্বাস্থ্য খাতের তুলনায় এটি একটি নৈতিক প্রশ্ন যেখানে রাজ্যে সরকারি হাসপাতলে বেড নেই, ডাক্তার নেই, ওষুধপত্র নেই, গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ, এই অবস্থায় মাদ্রাসা খাতে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ, এটি সরকার সৃষ্ট নৈতিক বৈষম্য। একটি শিশুর চিকিৎসা কি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মজহবি শিক্ষার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ? এর উত্তর প্রদান করেছে রাজ্য সরকারের এই অন্তর্বর্তী বাজেট। সরকার যদি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অস্বাভাবিক আর্থিক সুবিধা প্রদান করে, তাহলে সেটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মজহবি অগ্রাধিকার; এটি তথাকথিত সেকুলারিজম নয়, এটি বিশেষ তুষ্টীকরণের রাজনীতি।

ভোটব্যাংক রাজনীতিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে মুসলমান ভোট একটি বড়ো ফ্যাক্টর। সিপিএম দীর্ঘদিন এই ভোট ধরে রেখেছিল। তারাই ভোটব্যাংক রাজনীতির পথপ্রদর্শক। বর্তমান শাসক দল একই সর্বনাশা খেলায় মেতেছে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচকমণ্ডলী যদি এখনও চোখ বন্ধ করে থাকেন, তাহলে তাদের মঙ্গল স্বয়ং ভগবানও করতে পারবেন না।

শোক সংবাদ

গত ২১ জানুয়ারি প্রয়াত হলেন দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় এলাকার সঙ্ঘকাজের স্থপতি, প্রবীণ স্বয়ংসেবক প্রাণকৃষ্ণ রায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। রেখে গেছেন একমাত্র পুত্রবধূ ও একমাত্র নাতনিকে। উল্লেখ্য, সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে প্রচারক গোখলেজী (ভালচন্দ্র শঙ্কর গোখলে) দক্ষিণ কলকাতায় পূর্বতন প্রতাপাদিত্য ভাগের নিঃস্ব কলোনি অধুনা সুভাষপল্লীতে প্রাণদা, জীবনদার মতো কয়েকজন বালক-কিশোরকে নিয়ে সঙ্ঘ শাখা শুরু করেন। বর্তমানে সেই শাখা যাদবপুরের বিজয়গড় শাখা নামে পরিচিত।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ শচীন্দ্রনাথ রায়ের পিতৃদেব বুদ্ধদেব রায় গত ২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৪ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

মালদা জেলার বাঙ্গীটোলা শাখার স্বয়ংসেবক ধীরাজ মিশ্রের পিতৃদেব নির্মল চন্দ্র মিশ্র গত ২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৩ কন্যা, ১ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)		
Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

বিচারবিভাগীয় সংস্কার ছাড়া ‘বিকশিত ভারত’-এর স্বপ্ন অধরা থেকে যেতে পারে

গত ৮ জানুয়ারি কয়লাপাচার কেলেঙ্কারির তদন্তে কলকাতায় আইপ্যাকের অফিসে তল্লাশি চালায় ইডি। ওইদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাজেয়াপ্ত হওয়া কাগজপত্র ইডি আধিকারিকদের হাত থেকে কার্যত ছিনিয়ে নিয়ে চলে আসেন। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি। গত ৩ ফেব্রুয়ারি আইপ্যাক মামলা আরও এক সপ্তাহ পিছিয়ে যায়। ১০ ফেব্রুয়ারি শুনানির দিন নির্ধারিত হলেও ওইদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনজীবী কপিল সিব্বলের অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সেদিনও এই মামলার শুনানি ফের স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারিত হয়েছে ১৮ ফেব্রুয়ারি। গত ৩ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের সলিসিটর জেনারেল সর্বোচ্চ আদালতে এসে বলেন যে, তাঁদের আবেদনের প্রত্যুত্তরে আগের দিন অর্থাৎ ২ ফেব্রুয়ারি রাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছে এবং তার উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁদের আরও সাত দিন সময় প্রয়োজন। এখানে প্রশ্ন হলো কীভাবে বিচারবিভাগীয় সিস্টেম আগের দিন রাতে জমা করা এই হলফনামা জমা নিলো? কীভাবে ব্রিটিশ আমলের এই পদ্ধতি ১৯৪৭-এর পরেও এই দেশে চলছে? ২০০ বছর ধরে চলা এই বস্তাপচা সিস্টেমে এমনই হাজারখানা ব্যবস্থা তৈরি করে রাখা হয়েছে যা একটি মামলার বিচারকে বছরের পর বছর টেনে নিয়ে যেতে পারে। আর তার ওপর যত উঁচু আদালতে যাওয়া হয়, উকিলের খরচ তত বেশি। আজকের ভারতীয় বিচারব্যবস্থা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে যে, কোনো গরিব মানুষ যদি কোনো অসৎ, ধনী বা ক্ষমতাবান মানুষের অন্যায়ের শিকার হন, কিংবা কোনো সাধারণ মানুষ যদি কোনো অসৎ সরকারের অন্যায়ের শিকার হন, তাহলে তার ন্যায়বিচার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই একটুও অত্যুক্তি হয় না। যেমন বিচার পায়নি কামদুনির নিহত মেয়েটি, বিচার না পেয়ে প্রাণ হারালেন আমাদের পার্ক স্ট্রিটের বোনটি, আজও ক্ষতিপূরণ পাননি কার্টুন কাণ্ডের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধ্যাপক। ঐতিহাসিকভাবে বিচার করলে সাঁইবাড়ি, মরিচঝাঁপি, সঞ্জীব চ্যাটার্জি-তীর্থঙ্কর দাশশর্মা থেকে রাজেশ-তাপস কেউই কোনো বিচার পায়নি। সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবীর একদিনের ফি ৩৫ লক্ষ টাকা। ভারতের ০.০০০১ শতাংশ মানুষের ক্ষমতা রয়েছে এই টাকা দেওয়ার?

পরের প্রশ্ন, কেন গুটিকয়েক আইনজীবীর প্রতিদিনের এই ফি ৩৫ লক্ষ টাকা? কারণ, চাহিদা ও জোগান। প্রশ্ন হলো, দেশে এত উকিল প্রতি বছর আইন পাশ করছে, যাদের একটা বড়ো অংশ ‘সিএলএটি’ বা ক্ল্যাটের মতো সর্বভারতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ল’কোর্সে ভর্তি হয়েছে। তাহলে সুপ্রিম কোর্টে উকিলের জোগান চাহিদার তুলনায় কম না বেশি? এই চাহিদা-জোগানের অর্থনীতিতে তাঁদের ফি কীভাবে এত বেশি? এখানেই লুকিয়ে রয়েছে ভারতীয় বিচারব্যবস্থার একটা অন্ধকার দিক যা আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে বড়ো প্রতিবন্ধকতা। একজন উকিল যতই মেধা নিয়ে জন্মান এবং যতই তার জ্ঞান ও দক্ষতা থাকুক, তিনি যদি বিচারকের কাছে বিশেষ চেনা-পরিচিত কেউ না হন, পেশাগতভাবে তাঁদের কাছের মানুষ না হন, রাজনৈতিকভাবে কোনো কেউকেটা না হন, তবে বিচারক তাঁকে পাত্তাই দেবেন না। ফলে মানুষ বাধ্য হন সেই সব গুটিকতক উকিলের কাছে যেতে, যারা বিচারকদের কাছের মানুষ।

তাহলে প্রশ্ন, সব বিচারক কেন ওই গুটিকতক উকিলকে পাত্তা দেবেন? কিছু বিচারক কেন থাকবেন না যাঁরা নতুন মেধাকে গুরুত্ব দেবেন? এখানে বুঝতে হবে কীভাবে বিচারক নিয়োগ হয় আমাদের দেশে। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচার নিয়োগ হয় কলেজিয়াম সিস্টেমে, যে সিস্টেমের কোনো উল্লেখ ভারতীয় সংবিধানে নেই। বিভিন্ন সময়ে সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করে কয়েকটি রায়দানের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা তৈরি করেন কয়েকজন বিচারক। ‘কলেজিয়াম’ হলো সুপ্রিম কোর্টের সবচেয়ে সিনিয়র পাঁচজন বিচারকের একটি প্যানেল। কোনোরকম পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ না নিয়ে, কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বা কোনো গাইডলাইন না মেনেই কতিপয় সিনিয়র আইনজীবীদের মধ্যে থেকে উচ্চ ও সর্বোচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগ হয়। ফলে আনুগত্যই শীর্ষ আদালতের বিচারক হওয়ার একমাত্র রাস্তা। স্বজনপোষণ-নির্ভর, সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ এই পদ্ধতিতে যাঁরা নতুন বিচারক হন, তাঁরাও তাঁদের পূর্বসূরীদের মতোই সেই সব সিনিয়র উকিলদের বেশি গুরুত্ব দেবেন এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কেন এই পদ্ধতির পরিবর্তন আনে না? এই অভিশপ্ত ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে ২০১৪ সালে সংসদে ৯৯তম সংবিধান সংশোধনী আনে কেন্দ্র। সংসদে প্রণীত হয় ‘দ্য ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টস্ কমিশন অ্যাক্ট, ২০১৪’। কিন্তু ২০১৫ সালের ১৬ অক্টোবর এই আইন এবং সংবিধান সংশোধনীটিকে ‘অসাংবিধানিক’ ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্ট। আইনটিকে খারিজ করে সর্বোচ্চ আদালত জানায় যে, এই আইনটি বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ এবং ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী। পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে বিচারপতি জেএস খেহর, মদন লকুর, ক্যুরিয়ান জোসেফ ও আদর্শ কুমার গোয়েল এই আইনটিকে খারিজের পক্ষে থাকেন এবং বিচারপতি জস্তি চেলামেশ্বর এই আইনটিকে বৈধ বলে রায় দেন। অবসরের পর বিচারপতি ক্যুরিয়ান তাঁর এই রায়ের জন্য আক্ষেপ করেন। কিন্তু বিচারবিভাগীয় সংস্কারে বাধার ফলে ততদিনে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে।

২০৪৭-এ একটি উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার স্বপ্ন দেখছে বর্তমান ভারত। কিন্তু বাধা ভারতীয় বিচারব্যবস্থা। যার ফলে দেশজুড়ে সৃষ্টি হচ্ছে নানা নৈরাজ্য ও অরাজকতা। বিচারবিভাগীয় সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে আইনজীবীদের। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসে ভারতীয় ছেলে-মেয়েরা সফল কেরিয়ার গড়তে পারে, বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো তথ্য-প্রযুক্তি কোম্পানির সিইও হতে পারে, বিশ্ব ব্যাংক-আইএমএফ-এর চেয়ারম্যান হতে পারে, তবে কেন ভারতের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হওয়ার সব রাস্তা তাঁদের সামনে বন্ধ করছে তাঁদেরই প্রফেশনের কিছু মানুষ? এই অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে জনমত সংগঠিত হওয়া তাই সময়ের দাবি। □

নিয়ন্ত্রণের কূটনীতি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন ‘বন্ধুত্ব’ এবং বৈশ্বিক দেশভাঙনের ধারাবাহিকতা

আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিতে ‘বন্ধুত্ব’ কোনো স্থায়ী নৈতিক সম্পর্ক নয়; এটি একটি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা। যে দেশ নিয়ন্ত্রণযোগ্য, সে মিত্র; যে দেশ নিজস্ব পথ অনুসরণ করতে চায়, সে শত্রু।

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান কেবল একটি দেশের শক্তিবৃদ্ধির ঘটনা ছিল না। এটি ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতির নৈতিক ভাষা, ক্ষমতার কাঠামো ও প্রশাসনিক সার্বভৌমত্বের ধারণার মৌলিক পুনর্গঠন। যুদ্ধশেষে ইউরোপ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে দ্বিমেরু বিশ্বব্যবস্থার সূচনা এবং ‘উপনিবেশ’ তকমামুক্ত হয়ে নতুন দেশগুলোর আবির্ভাব— এই সব প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে ‘মুক্ত বিশ্বের নেতা’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু এই নেতৃত্ব আদতে কোনো বিশ্বজনীন সমতাভিত্তিক নৈতিক কাঠামোর উপর দাঁড়ায়নি; বরং এটি দাঁড়িয়েছে ভূ-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, সামরিক আধিপত্য এবং বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ওপর। মার্কিন গণতন্ত্রের অনেকটাই মুখোশ। বিশ্ববাসী আশা করেছিল একটা মানবিক পৃথিবী সূচিত হবে। কিন্তু সে আশা ধুলায় মিশিয়ে বিশ্ব দেখতে শুরু করলো বিপরীত বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড। এই বাস্তবতা থেকেই বিশ্ব রাজনীতিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নির্যাস হিসেবে একটি নির্মম বাক্য জন্ম নিয়েছে— ‘আমেরিকা যার বন্ধু, তার আর কোনো আলাদা শত্রুর প্রয়োজন পড়ে না’।

এই বাক্যটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে ‘বন্ধুত্ব’ শব্দটি পারস্পরিক আস্থা বা দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার প্রতীক নয়; এটি একটি শর্তাধীন সম্পর্ক, যেখানে শক্তিশালী পক্ষের স্বার্থই চূড়ান্ত মানদণ্ড। যতক্ষণ কোনো দেশ মার্কিন কৌশলগত কাঠামোর ভেতরে থাকে, কথা মতো চলে, বাজার শর্ত মেনে সেদেশে মার্কিন পুঁজিলগ্নি কার্যকর থাকে ততক্ষণ সে মিত্র; আর সেই কাঠামোর বাইরে যাওয়ার সামান্য ইঙ্গিত দিলেই সম্পর্ক রূপ নেয় শত্রুতায়। সঙ্গে সঙ্গেই কূটনৈতিক চাপ কিংবা নগ্ন হস্তক্ষেপ। এই নীতির প্রথম সুস্পষ্ট প্রয়োগ দেখা যায় ১৯৫৩ সালে ইরানে, যখন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ মোসাদ্দেক তেল সম্পদের ওপর জাতীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হন। এটি ছিল একটি সার্বভৌম দেশ হিসেবে ইরানের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু তা মার্কিন ও ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় সিআইএ সমর্থিত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে উৎখাত করা হয় এবং শাহের একনায়কতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন শাহ মার্কিন ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে টিকে থাকলেও এই সম্পর্ক টিকে ছিল কঠোর নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে ইরান যখন সেই নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করে, তখনই দেশটি নিষেধাজ্ঞা, কূটনৈতিক অবরোধ ও সামরিক হুমকির স্থায়ী লক্ষ্যে পরিণত হয়। এখানে আদর্শগত দ্বন্দ্বের চেয়ে নিয়ন্ত্রণ হারানোর বিষয়টিই মুখ্য ছিল।

ইরাকের অভিজ্ঞতা এই নীতির আরও হিংসাত্মক রূপ উন্মোচন করে। ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় সাদ্দাম হোসেন ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন কৌশলগত জোটের অংশীদার। সেই সময় তাকে সামরিক ও গোয়েন্দা সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। এমনকী রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগেও কার্যকর প্রতিবাদ করেনি আমেরিকা। কিন্তু কুয়েত আক্রমণ এবং আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তনের পর সাদ্দাম আর উপযোগী মিত্র হিসাবে থাকতে পারেনি। নব্বইয়ের দশকে নিষেধাজ্ঞা এবং ২০০৩ সালে তথাকথিত গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরির অজুহাতে সরাসরি আগ্রাসনের মাধ্যমে ইরাকের সরকারি কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ভেঙে ফেলা হয়। পরবর্তীতে স্বয়ং মার্কিন তদন্তেই প্রমাণিত হয় যে, সে অস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। তবু ততদিনে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, সরকারি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস এবং ইসলামিক স্টেটের মতো উগ্র গোষ্ঠীর উত্থান ইরাককে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এখানে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা— দুটো পর্যায়ই একই দেশের জন্য সমানভাবে বিধ্বংসী প্রমাণিত হয়েছে। অন্যায়ভাবে ফাঁসিতে ঝুলানো হয় সাদ্দাম হোসেনকেও।

আফগানিস্তানের ইতিহাস এই ধারাবাহিকতার আরেকটি জটিল অধ্যায়। সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধে মুজাহিদিনদের সমর্থনের মাধ্যমে আফগানিস্তানকে একটি সন্ত্রাসবাদী দেশে পরিণত করার চেষ্টা হয়। কারণ প্রকৃত ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত সবসময়ই বহিরাগত শক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। ২০২১ সালে হঠাৎ করে মার্কিন সমর্থন প্রত্যাহার আফগানিস্তানকে আরও গভীর মানবিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করে। তালিবানের পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে দুই দশকের বন্ধুত্ব দেশকে স্থিতিশীল করেনি; বরং তার কাঠামোগত দুর্বলতাকে স্থায়ী করেছে। ফলে দেশটিতে উগ্র মুসলমান মোল্লাদের শাসন পুনরায় চালু হয়। বর্তমানে সেখানে মানবাধিকারের বিপর্যয় চলছে। নারীদের

কোনো অধিকার তো নেই-ই বরং তাদের পুতুলের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। ইসলামি শরিয়া আইন সেখানে কার্যকর করা হয়েছে। যার ফলে আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠেছে অনিশ্চিত।

লিবিয়া এই নীতির সবচেয়ে স্পষ্ট ও নির্মম দৃষ্টান্ত। মুয়াম্মার গাদ্দাফি পশ্চিমি বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে গিয়ে পারমাণবিক কর্মসূচি ত্যাগ করেন এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির আশ্বাস পান। কিন্তু আরব বসন্তের প্রেক্ষাপটে ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতেই ন্যাটোর সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে তার শাসন উৎখাত করা হয়। 'Leading from behind' নীতির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি নয়, রণকৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এর ফলাফল আজ সুস্পষ্ট— লিবিয়া একটি ব্যর্থ দেশ, যেখানে মিলিশিয়া শাসন, মানবপাচার ও দাসবাজার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। এই অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, আপোশকামী মানসিকতা নিরাপত্তা দেয় না; বরং নিরস্ত্রীকরণ দেশকে আরও ভঙ্গুর ও দুর্বল করে তোলে।

সিরিয়া, ভেনেজুয়েলা ও কিউবার ক্ষেত্রেও একই নীতির ভিন্ন রূপ দেখা যায়। সিরিয়ায় সরকার পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিদ্রোহী গোষ্ঠী সমর্থন, নিষেধাজ্ঞা ও সামরিক হস্তক্ষেপ একটি দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ ও মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে রেখেছে আমেরিকা। ভেনেজুয়েলায় তেলসম্পদের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির কারণে দেশটি অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়। নির্লজ্জের মতো দেশটির প্রেসিডেন্টকে রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে গেছে আমেরিকা। একটি স্বাধীন দেশের উপরে এইরূপ নগ্ন হস্তক্ষেপ গোটা পৃথিবীকে অবাক করেছে। কিউবায় বাতিস্তা সরকার মার্কিন মিত্র থাকলেও কাস্ত্রোর বিপ্লবের পর দেশটি কয়েক দশক ধরে মার্কিনি অবরোধের মধ্যে রয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার ভাষা ব্যবহৃত হলেও বাস্তবে সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় থাইল্যান্ড, মায়ানমার, হংকং ও শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা দেখায় যে, এখানে মার্কিন নীতি আরও সূক্ষ্ম ও সমানভাবে বিপজ্জনক। থাইল্যান্ডে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান সত্ত্বেও সামরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকার মাধ্যমে মার্কিন আধিপত্য কায়েম রয়েছে। মায়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর নৈতিক সমর্থন বাস্তব সুরক্ষায় রূপ নেয়নি, ফলে দেশটির ওপর চীনের কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরও সুসংহত হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় ঋণনির্ভর অর্থনীতি ও বহিরাগত চাপ দেশটির কাঠামো ভাঙনকে ত্বরান্বিত করেছে, যার পরিণতিতে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা ছেড়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

লাতিন আমেরিকায় চিলি, নিকারাগুয়া, এল সালভাদর, হন্ডুরাস, হাইতি ও গ্রেনাডার অভিজ্ঞতা মার্কিন নীতির ধারাবাহিকতা আরও স্পষ্ট করে। চিলিতে আলেন্দের গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাতে সরাসরি ভূমিকা, নিকারাগুয়ায় সান্দিনিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে বৈরিতা, এল সালভাদর ও হন্ডুরাসে গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় নীরব সমর্থন— সবই একই কৌশলের অংশ। হাইতিতে ধারাবাহিক মার্কিন হস্তক্ষেপ দেশটিকে কার্যত ভেঙে দিয়েছে। আফ্রিকা ও পূর্ব ইউরোপে জিম্বাবুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইথিওপিয়া, সুদান, রাশিয়া, ইউক্রেন ও জর্জিয়ার অভিজ্ঞতা দেখায় যে শীতল যুদ্ধোত্তর বিশ্বেও বন্ধুত্ব কত দ্রুত শত্রুতায় রূপ নিতে পারে। ন্যাটো সম্প্রসারণ, নিষেধাজ্ঞা ও প্রক্সিযুদ্ধ এই অঞ্চলে দেশগুলির সার্বভৌমত্বকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপালের অভিজ্ঞতা দেখায় যে ছোটো ও মাঝারি দেশগুলোর জন্য এই নীতি কতটা বিপজ্জনক। এক সময়ের মিত্র পাকিস্তান আজ অবিশ্বাস ও চাপের রাজনীতির শিকার। নেপাল বিদেশি শক্তির টানাপোড়েনে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক অস্থিরতায় আটকে আছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ভাষার আড়ালে ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ রাজনৈতিক মেরুকরণ ও বিদেশি শক্তিনির্ভরতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে তার নগ্ন রূপ প্রকাশ পেয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার কখনো আমেরিকার প্রেসক্রিপশন মেনে নেয়নি বলে আজও বাংলাদেশে হত্যার রাজনীতি স্বাভাবিক রূপ নিয়েছে। ২০২৪-এর পর দেশটির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে বিদেশি শক্তির ভূ-রাজনৈতিক খেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে 'গণতন্ত্র', 'সুশাসন' ও 'মানবাধিকার'-এর ভাষা ব্যবহার করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নির্বাচন ব্যবস্থা, সরকার গঠন, প্রশাসনিক কাঠামো এমনকী নীতিনির্ধারণ— সব ক্ষেত্রেই বহিরাগত চাপ ও বার্তা এখন প্রকাশ্য বাস্তবতা।

এই অভিজ্ঞতাগুলো একত্রে দেখায়— আমেরিকার নীতি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা দেশভেদে আলাদা নয়। ইরাক হোক, ইরান হোক, লিবিয়া, আফগানিস্তান বা ভেনেজুয়েলা— প্যাটার্ন একই। কোথাও সরাসরি সামরিক আগ্রাসন, কোথাও নিষেধাজ্ঞা, কোথাও অভ্যন্তরীণ বিরোধ উসকে দেওয়া, কোথাও সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা। উদ্দেশ্য একটাই— স্বাধীন দেশকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য দুর্বল দেশে পরিণত করা। সর্বশেষ লাতিন অমেরিকায় ভেনেজুয়েলার ঘটনা এই একই কৌশলের আরেক নতুন রূপ। প্রথমে হুগো শাভেজ ও পরে নিকোলাস মাদুরোর নেতৃত্বে ভেনেজুয়েলা যখন তেলসম্পদের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির পথে হাঁটতে চেয়েছে, তখনই দেশটি আমেরিকার টার্গেটে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, অভ্যন্তরীণ বিরোধ উসকে দেওয়া এবং মানবিক সংকটে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্রের নামে এই চাপ বাস্তবে সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে, কিন্তু শাসনব্যবস্থার সংকটকে আরও জটিল করেছে। এটি দেখায়, আমেরিকার বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতা— দুটোই অনেক সময় একটি দেশের জন্য সমানভাবে বিধ্বংসী।

এই সব অভিজ্ঞতা মিলিয়ে গবেষণাগতভাবে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিতে 'বন্ধুত্ব' কোনো স্থায়ী নৈতিক সম্পর্ক নয়; এটি একটি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা। যে দেশ নিয়ন্ত্রণযোগ্য, সে মিত্র; যে দেশ নিজস্ব পথ অনুসরণ করতে চায়, সে শত্রু। এই বাস্তবতায় ছোটো ও মাঝারি দেশগুলোর জন্য একমুখী পররাষ্ট্রনীতি আত্মঘাতী। বহুমুখী কূটনীতি, অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা ছাড়া সার্বভৌমত্ব রক্ষা সম্ভব নয়। ইতিহাস বারবার এই সত্যই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। □

তৃতীয় বিশ্ব থেকে তৃতীয় মেরু

‘মাদার অফ অল ডিলস্’ স্বাক্ষরে হলো দীর্ঘ যাত্রার অবসান

মামুদের আক্রমণ থেকে বড়োলাট মাউন্টব্যাটেন— বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের এক ঘনান্ধকার কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল ভারত। সেই ভারতের শক্তি দর্শন করে পৃথিবী আবার সচেতন হলো আজ। ‘ভারত’ হলো এক দীপ্তনেত্রের মালা। ভারত যে বিশাল, গোটা বিশ্ব থেকে ভারত যে বিচ্ছিন্ন নয়, তারই প্রমাণ হলো এই ‘মাদার অফ অল ডিলস্’।

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

ধর্ম ও কর্মের ভারসাম্য রক্ষার মতো বড়ো কৃতিত্ব, বড়ো জনমুখী কৌশল এবং বহুমাত্রিক পদক্ষেপ আর দ্বিতীয়টি হয় না। এই সামঞ্জস্য রক্ষায় ভারত শ্রেষ্ঠ ছিল। এই কারণেই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কেন্দ্র ছিল ভারতবর্ষ। তারপর হিংস্র, বর্বরদের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে ভারত। স্বাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে দেশ। ১৯৪৭ সালে খণ্ডিত ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও দেশে ‘স্বতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনেক মেধা, বুদ্ধি, কৌশলগত চিন্তাধারা, প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের পক্ষ থেকে কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ দৃশ্যমান হয়নি। ঘটনা বিশেষে ভারত সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ দেশের সার্বভৌমত্ব প্রদর্শন করলেও ভারত কিন্তু থেকে গিয়েছিল একটা ট্যাগে— ‘থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি’ বা তৃতীয় বিশ্বের দেশ। এরপর অর্থনীতি কিঞ্চিৎ প্রসারিত হলে ভারত হয়ে ওঠে ‘ডেভেলপিং কান্ট্রি’ বা উন্নয়নশীল দেশ। ২০১৪ সালের পর থেকে ভারত ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে উদীয়মান দেশ। ২০৪৭ সালের লক্ষ্যে ভারত সরকারের প্রকল্প হলো— ‘বিকশিত ভারত’। ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগণের বুদ্ধি, শ্রম, কূটনৈতিক উদ্যোগের কারণে আন্তর্জাতিক রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে ভারত বর্তমানে হয়ে উঠেছে অন্যতম ডিসাইডিং ফ্যাক্টর। নিজস্ব প্রয়াস ও সাধনায় বিশ্ব রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের প্রভাব ও দাপট। ভারতের চিরকালীন তেজ আর নতুন ভারতের অভাবনীয় বেগের জোরে বিশ্বের দরবারে বিশেষ আসন অধিকার করল ভারত।

বহুমেরু বিশ্বে একমেরু শক্তি (ইউনিপোলার পাওয়ার ইন এ মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ড) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এই নতুন ভারত। ১৯৪৫ সালে শেষ হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিশ্ব রাজনীতিতে নানা মেরুকরণ দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন— এই দু’টি মেরুতে বিভাজিত ছিল গোটা বিশ্ব। ’৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামরিক শক্তিতে দ্রুত উত্থান ঘটে চীনের। এই দ্বিমেরু বিশ্ব রাজনীতির বিপ্রতীপে একটি তৃতীয় মেরুরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে বর্তমান ভারত। এই ভারত হলো আপোশহীন এক শক্তি। পররাষ্ট্রনীতির পরিভাষায় এই তৃতীয় মেরু বা থার্ড পোলের অর্থ অনেক গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব রাজনীতির তৃতীয় মেরু সেই, যে অনেক কিছুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রক; যে দেশ

কারুর কূটনৈতিক বশ্যতা স্বীকার করে না। 'তৃতীয় মেরু' কিন্তু কোনো আভিধানিক শব্দ নয়। এই তকমাটি হলো দেশের আত্মমর্যাদার মুকুট। এ হলো আন্তর্জাতিক স্তরের তাবড় শক্তিসমূহের চোখে চোখ রেখে নিজস্ব নীতি নির্ধারণের সামর্থ্য; কারুর চোখ রাঙানি সহ্য না করার সাহস। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'তৃতীয় মেরু' হলো এক অনন্য বলিষ্ঠতার নাম; রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পারদর্শিতার নমুনার সঙ্গে অর্থনৈতিক মজবুতির সিলমোহর। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষায় উদারতা, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পারস্পরিক মৈত্রী, সৌহার্দ্য, বৃহৎ সামরিক শক্তিগুলির সঙ্গে সমকক্ষতা, বহির্দেশীয় প্রভাবহীন সার্বভৌমত্ব, যাবতীয় কূটনৈতিক কৌশলে রপ্ত এবং ছোটো-বড়ো সবরকম আন্তর্জাতিক শক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম এই সশক্ত ভারত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সাম্প্রতিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বাস্তুতন্ত্রে 'তৃতীয় মেরু' হওয়ার প্রমাণ আরেকবার দিল ভারত। এর আগেও অসংখ্য বার প্রমাণিত হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে নেতৃত্বদানে সক্ষম ভারত। বিশ্ব অর্থনীতিতেও ভারত হয়ে উঠেছে মধ্যমণি। গত ২৭ জানুয়ারি শুরু হলো বিশ্ব অর্থনীতির এক নতুন অধ্যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মোট ২৭টি দেশের সঙ্গে ভারতের ফ্রি-ট্রেড এগ্রিমেন্ট সম্পাদিত হলো। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও ভারত হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। পশ্চিমি সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য না হয়েও সম্প্রতি যে কোনো ন্যাটো-সদস্য দেশের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে ভারত। আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন বড়ো ও ছোটো শক্তিগুলির মধ্যে সমতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে ভারত। ইজরায়েল, প্যালেস্তাইন, রাশিয়া বা অন্যান্য অবিবেচক দেশের মতো উগ্র, অমানবিক আচরণ, ধ্বংসাত্মক পররাষ্ট্রনীতি, নিরপেক্ষতাহীন কূটনীতি ও অস্থির সমরনীতির প্রয়োগ করেনি ভারত। এসব কিছুতে কোনোরকম সমর্থনদানও করেনি। আন্তর্জাতিক স্তরে কূটনীতিতে অসাধারণ সাফল্যের কারণেই 'তৃতীয় মেরু' হয়ে উঠতে পেরেছে ভারত। আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সাহায্য, সমর্থন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান প্রয়োজন। রাজনৈতিক ও সামরিক শত্রুতা, সন্ত্রাসবাদী হানাদারি, যুদ্ধ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োজন প্রত্যাঘাত— সব ক'টি ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব পারফরম্যান্স দেখিয়ে চলেছে ভারত। 'তৃতীয় মেরু' হয়ে উঠতে পারে সেই দেশ, যে দেশ কোনোভাবেই পরনির্ভরশীল নয়; কোনো অনভিপ্রেত ইস্যুতে উগ্র, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় কোনো বড়ো অস্থিরতার জন্ম দেয় না যে দেশ। এ হলো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ভারতবর্ষ, সম্রাট অশোকের ভারতবর্ষ, ভগবান বুদ্ধের ভারতবর্ষ। সেই প্রাচীন ভারতবর্ষও সারা বিশ্বের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল; সফট্ পাওয়ারের প্রতিমূর্তি ছিল, আন্তর্জাতিক সমুদ্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রক ছিল। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ চিরকালই ছিল একটি মহান দর্শন, চেতনা ও উপলব্ধির বটবৃক্ষ। সেই বৃক্ষের ছায়াই যেন দিতে চলেছে বর্তমান ভারত সমগ্র বিশ্বকে।

'জি-২' বাইনারি ফ্রেমওয়ার্ক, অর্থাৎ আমেরিকা-চীনের দ্বিপাক্ষিক আধিপত্যের ব্যবস্থায় জল ঢালল ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন 'মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি'। গত ২৭ জানুয়ারি ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ভারতের যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো তা আগামীদিনে সমুদ্র সুরক্ষা থেকে মহাকাশ গবেষণা, নিউক্লিয়ার নন-প্রলিফারেশন থেকে সাইবার সুরক্ষা, সন্ত্রাস দমন থেকে যুদ্ধ প্রতিরোধ, নিরস্ত্রীকরণ— প্রভৃতি ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের জন্য বহুমাত্রিকভাবে ফলদায়ক উদ্যোগের প্রভূত সম্ভাবনা সৃষ্টি করল। শুধু তাই নয়, এই চুক্তিতে তথ্য সংগ্রহ (ডেটা কালেকশন) এবং সংগৃহীত তথ্যের সুরক্ষা বা ডেটা সিকিউরিটি-র বিষয়েও গুরুত্ব দিয়েছে দু'পক্ষ। চুক্তি অনুযায়ী, দ্বিপাক্ষিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্যের আদানপ্রদান চলবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলি ভারতের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলো, যেখানে উল্লেখিত হলো, "India's partnership in EU security and defence intiatives in line with EU Treaty-based framework."। এর ফলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, গ্লোবাল পাওয়ার ডায়নামিক্সে ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজা কালাস উল্লেখ করেছেন যে, সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে গৃহীত চুক্তিটিই হলো এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি। এই সবকিছু থেকে এটা স্পষ্ট যে, ভারতের প্রতি, ভারতের সামরিক সক্ষমতার প্রতি কতটা আস্থাশীল বর্তমান ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ভারত ন্যাটো সদস্য নয়, এই বিষয়টি বর্তমানে গুরুত্বহীন। বর্তমানে সম্পূর্ণ উলটো পরিস্থিতি। ন্যাটোই ভারতের প্রতি মনোযোগী ও আগ্রহী। সামুদ্রিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে আগে একটি কূটনৈতিক কৌশল গ্রহণ করে ভারত। 'সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ ফর অল ইন দ্য রিজিয়ন, ২০১৫'-শীর্ষক সেই কৌশলটি সংক্ষেপে 'সাগর' হিসেবে পরিচিত ছিল। বর্তমানে তা প্রসারিত হয়ে 'মহাসাগর' (মিউচুয়াল অ্যান্ড হোলিস্টিক অ্যাডভান্সমেন্ট ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ অ্যাক্রস রিজিয়ন্স, ২০২৫)-নামক স্ট্র্যাটেজিতে পরিণত হয়েছে। এই ধরনের স্ট্র্যাটেজি বা কৌশলগত নীতি প্রণয়নের কারণে ইন্দো-প্যাসিফিক রিজিয়ন বা ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেন-দেন সংক্রান্ত যে সুরক্ষা কৌশল ভারত প্রদর্শন করছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এই বিষয়টিতে ভারতের সাফল্যকে পররাষ্ট্রনীতির ভাষায় 'স্ট্র্যাটেজিক ডেপথ্ উইদাউট অ্যালাইনমেন্ট' আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হবে না।

বর্তমানে ন্যাটো সদস্য দেশগুলি খানিক দ্বন্দ্বের মধ্যেও বিদ্যমান। কারণ, গ্রিনল্যান্ড দখলের জন্য আগ্রাসী হয়েছে আমেরিকা। সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করে যে হারে ন্যাটো সদস্য দেশগুলির ওপর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা ন্যাটো সদস্য-সহ সমগ্র পশ্চিমি দুনিয়ার কাছে রীতিমতো বিরক্তিকর ও অবাঞ্ছনীয় একটি বিষয়। বিষয়টি পশ্চিমি দেশগুলির সঙ্গে আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে তিক্ততা আনতে বাধ্য। এছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকার অসহিষ্ণু আচরণ এবং তাদের লোভী, সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটা ন্যাটো সদস্য দেশগুলিকে সম্প্রতি নাড়া দিয়েছে। আমেরিকার প্রতি পুঞ্জীভূত ক্ষোভের কারণে আমেরিকাকে 'রিলায়েবল্ পার্টনার' বা নির্ভরযোগ্য মিত্র বলে মেনে নেওয়াটা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলির পক্ষে বর্তমানে বেশ কঠিন। এহেন পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিকল্প,

বিশ্বাসযোগ্য শক্তির সন্ধানে ছিল পশ্চিমি বিশ্ব। এমতাবস্থায় ভারত হয়ে ওঠে একমাত্র বিকল্প। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে যথাযথ সম্মানের পাশাপাশি শক্তি প্রয়োগ ও উদারতার সমন্বয় প্রদর্শন করে থাকে ভারত। আজকের অস্থির পৃথিবীতে আর কোন দেশ দেখাতে পারে এই অভূতপূর্ব সমন্বয়? মেরিটাইম স্ট্র্যাটেজি বা সামুদ্রিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হলো এক নতুন ইতিহাস, যখন ন্যাটো সদস্য দেশগুলি ছুটে এলো ভারতের কাছে সমুদ্র সুরক্ষার পাঠ নিতে। এরপর ভারত ন্যাটো সদস্য হলো কী হলো না, তা সত্যিই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল। স্ট্র্যাটেজিক ব্যালেন্স ও জিও-স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ স্কিলের কারণে ন্যাটোর চোখে 'বিশ্বগুরু' হয়ে উঠেছে ভারত। ন্যাটো কিংবা ন্যাটো প্লাস ফাইভ, অর্থাৎ ন্যাটো সামরিক জোটের সঙ্গে পাঁচটি মিত্র দেশ— অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, ইজরায়েল ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদান ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের যে চুক্তি রয়েছে, তার কোনো ক্ষেত্রেই অফিশিয়াল সদস্য না হয়েও বিশ্বজনীন 'তৃতীয় মেরু' হয়ে উঠতে পেরেছে বর্তমান ভারত। ইন্টারনেট পরিষেবা উন্নয়ন থেকে ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং— যেখানে যেখানে কৌশলগত আদানপ্রদান, সেইসব ক্ষেত্রেই ভারতের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো আমেরিকা এই সুযোগে চাইছিল ইন্দো-প্যাসিফিক যোগ চুক্তি করতে। ভারত স্পষ্টভাবেই তা নাকচ করেছে। ভারত হয়তো ন্যাটো প্লাস ফাইভের সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত হবে না। কারণ তা রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে জটিলতা আনতে পারে। এরকম বিস্ময়কর স্থিতিস্থাপক কৌশলের পদক্ষেপে ভারসাম্যের কূটনীতিতে অগ্রগামী আজকের ভারত। এক কথায় একে বলা যায়— 'লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ'। এমন কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করা থেকে বিরত রয়েছে ভারত যা যে কোনো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এলোপাথারি ঝঞ্ঝা বয়ে আনতে পারে। জানুয়ারির শেষে স্বাক্ষরিত হওয়া 'সিকিউরিটি অ্যান্ড ইনফরমেশন এগ্রিমেন্ট' ভারতকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং বা গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদানের পথ প্রশস্ত করল। যা কিন্তু ন্যাটো সদস্য না হলে এতদিন হতোই না। তৃতীয় মেরু-র শক্তি ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণে আর হয়তো কিছু বাকি নেই। বাস্তবিক অর্থেই এই চুক্তি হলো— 'মাদার অফ অল ডিলস্'।

এরপরই টনক নড়ল আমেরিকার। যেই না ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো, অমনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সুর নরম করলেন। চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র ৪ দিনের মধ্যেই তার আচরণে এলো কিঞ্চিৎ পরিবর্তন। ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছিলেন তিনি। মাঝে তা বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করার হুমকিও দিয়েছিলেন। আচমকাই তা কমে হয়ে গেল ১৮ শতাংশ। ট্রাম্প গদগদ হয়ে বললেন যে, আমেরিকা, ভেনেজুয়েলা— সবার থেকেই খনিজ তেল কিনতে পারবে ভারত। বিশ্বমাঝে ভারত যে সত্যিই তৃতীয় মেরু হয়ে উঠেছে, এ ঘটনা তার আরেকটি প্রামাণ্য সূচক। না হলে আমেরিকার মতো উদ্ধত একটি দেশ ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের চুক্তির পরই এরকমভাবে তার অবস্থান পরিবর্তন করত না। দীর্ঘদিন ধরেই বহুমাত্রিক কূটনৈতিক দর্শনের প্রয়োগ চাইছিল গোটা বিশ্ব। পৃথিবী চাইছিল যে, এমন একটি দেশ বিশ্বজনীন নেতৃত্বে আরোহণ করুক, যে দেশ তেজ ও ত্যাগ, শক্তি ও প্রেম, জোর ও উদারতা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সফট্ পাওয়ার, প্রতিরক্ষা ও মানবতা, প্রতিরোধ ও আলিঙ্গন, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ ও বিশ্বশান্তি, জাতীয় স্বার্থ ও কূটনৈতিক কৌশল, সমুদ্র সুরক্ষা ও সামুদ্রিক সংঘাত নিষ্পত্তি— এই সব ক'টি ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ভারসাম্য প্রদর্শন করতে পারে; বিশ্বমানবচেতনার যা যা উন্নত মার্গ রয়েছে, সেই সব রত্নখনির সন্ধান দিতে পারে; বিষ নির্বাপিত করে পৃথিবীকে অমৃত মন্থনে উৎসাহিত করতে পারে। ভারত ছাড়া অন্যান্য সব বৃহৎ শক্তি বিশ্বজনীন ক্ষেত্রে নানাভাবে কালো দাগ ফেলেছে। ভারতের ইতিহাস বিশ্বকে দেখিয়েছিল যে এই দেশ কর্মকে প্রবৃত্তির হাতে ছাড়ে না। অস্ত্রকে উত্তেজনার হাতে তুলে দেয় না। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সাময়িক উত্তেজনাকে প্রাধান্য দেয় না। রাজধর্ম, জ্ঞানচর্চা, ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পকলা, যুদ্ধবিদ্যা— একযোগে অনুশীলন করেছে প্রাচীন ভারতবর্ষ; আবারও করছে উদীয়মান ভারত। ভারতবর্ষের একটি বাণী রয়েছে। সমগ্র জগৎকে তা একদিন শুনতে হবে। সেই শক্তিতে উঠে দাঁড়িয়ে বিশ্বকে আজ নেতৃত্ব দিচ্ছে ভারত। 'তৃতীয় মেরু' হিসেবে ভারত আরও এক বার স্বীয় স্থানাধিকার করল ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র চুক্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। মিলিটারিজমে বিশ্বাস করে ভারত যে একটি যুদ্ধবাজ দেশে পরিণত হয়নি, যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও ভারত যে ধর্ম স্থাপনের পন্থায় পরিচালিত হয়, এই চুক্তির মাধ্যমে আধুনিক আন্তর্জাতিক মঞ্চে তা আরও একবার স্বীকৃতিলাভ করল। তেজ ও ত্যাগের সামঞ্জস্য রক্ষার দায়িত্ব আজ পর্যন্ত কোনো বৃহৎ আন্তর্জাতিক শক্তি পালন করতে পারেনি। হিন্দুকুশ থেকে হিমালয়, হিমালয় থেকে তিব্বত--- এই অঞ্চলটিকেও ভৌগোলিকভাবে 'থার্ড পোল' বা তৃতীয় মেরু বলা হয়ে থাকে। মানব সভ্যতার ঊষালগ্নে এই অঞ্চলটিই সমগ্র মানবজাতিকে বোধোদয়ের পাঠ শিখিয়েছিল। আজও অদ্ভুতভাবে সেই 'থার্ড পোল' শব্দবন্ধটিই পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারতের মাথায় নেতৃত্বের মুকুট পরালো। 'লিবারেল ওয়ার্ল্ড অর্ডার'-এর খোঁজ করছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন। 'ফ্রম এ স্লিপিং টু এ লিডিং মিডল্ পাওয়ার'- এ ভারতের উত্তরণ ঘটল। বহু শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষই যে বিশ্বজনীন বোধের মর্মস্থান, সেই বিষয়টির পুনর্মূল্যায়ন হলো। মামুদের আক্রমণ থেকে বড়োলাট মাউন্টব্যাটেন— বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের এক ঘনান্ধকার কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল ভারত। সেই ভারতের শক্তি দর্শন করে পৃথিবী আবার সচেতন হলো আজ।

'ভারত' হলো এক দীপ্তনেত্রের মালা। ভারত যে বিশাল, গোটা বিশ্ব থেকে ভারত যে বিচ্ছিন্ন নয়, তারই প্রমাণ হলো এই 'মাদার অফ অল ডিলস্'। পরিণত পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে পুনরায. স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হয়ে এবং 'তৃতীয় মেরু'র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভের মধ্যে দিয়ে এক নিগূঢ় রাষ্ট্রগৌরবের ভিত্তি স্থাপন করল নতুন ভারত। □

সহিষ্ণুতা হতে হবে সবার, একার নয়

অজয় ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষ বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি, বহু বিশ্বাসের মিলনভূমি। এই ভূখণ্ডের সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সহাবস্থান। একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। এই ঐতিহ্যের কেন্দ্রে রয়েছে সহিষ্ণুতা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সহিষ্ণুতার দায় কি একতরফা? সে দায় কি কেবল হিন্দুদেরই? ভারতের পরিদৃশ্যে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, সহিষ্ণুতার দায় কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদেরই। ভারতীয় সংবিধানের ২৫(২খ) ধারার ব্যাখ্যা অনুযায়ী হিন্দু অর্থে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধরাও অন্তর্ভুক্ত।

সহিষ্ণুতা মানে অন্যের বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও মতকে সম্মান করা। ভারতীয় দর্শনে বসুধৈব কুটুম্বকম্ বা সমগ্র বিশ্ব এক পরিবার ভাবনা এই চেতনাকে শক্তিশালী করেছে। হিন্দু দর্শনের পরিসরে নানা মত-পথ ও উপাসনার স্বাধীনতা রয়েছে। তাই হিন্দু সমাজ স্বাভাবিকভাবেই উদার। কিন্তু সহিষ্ণুতা যদি একতরফা হয়ে থাকে, তখন তা সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন সহিষ্ণুতা আর পারস্পরিক সম্মানের বিষয়বস্তু হয়ে থাকে না, বরং তা একপক্ষের নীরব সহ্যশক্তিতে পরিণত হয়। সহিষ্ণুতা একটি মানবিক গুণ, কেবল হিন্দুদের একার দায় নয়। তাই যখন কেবল হিন্দুদেরই সহনশীল হতে বলা হচ্ছে, তখন তাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে।

ভারতের শক্তি তার বৈচিত্র্যে। সেই বৈচিত্র্য টিকে থাকবে তখনই যখন সহিষ্ণুতা হবে পারস্পরিক, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক— সবকিছুর যৌথ অঙ্গীকার। ভিন্ন মত, ভিন্ন বিশ্বাস, ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে থেকেও পারস্পরিক মিলনের নাম সহিষ্ণুতা। ভারতের মতো বহু বিশ্বাস ও বহু ভাষার দেশে এই গুণ শুধু নৈতিক আদর্শ নয়, বরং সামাজিক সুস্থিতির একটি আবশ্যিক শর্ত। কিন্তু বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনার প্রায়ই শোনা যায়, সহিষ্ণুতা কি একতরফা? শুধুমাত্র হিন্দু সমাজকেই কি বারবার সহনশীলতার পরীক্ষা দিতে হবে?

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, হিন্দু দর্শনের মধ্যে বহু মত-পথের মধ্যে সহাবস্থানের অনুশীলন অতি প্রাচীন। বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি, দর্শন, দেব-দেবী সত্ত্বেও সবাই এই সংস্কৃতির মধ্যে স্থান পেয়েছে। এই ঐতিহ্য হিন্দু সমাজকে বিশ্বের মধ্যে এক অতুলনীয় স্থান করে দিয়েছে। কিন্তু আরব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করার পরই এই ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের কোথাও উল্লেখ নেই যে এক পক্ষ সহনশীল হবে এবং অন্যপক্ষ অসহিষ্ণু থাকবে। রাজনৈতিক পক্ষপাতের কারণে সংবিধানের সেকুলার শব্দটির উপযোগিতার বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

গণতন্ত্রে মতপ্রকাশ, প্রতিবাদ, ন্যায়বিচারের দাবি বৈধ। তবে তার পদ্ধতি হতে হবে সংবিধানসম্মত। কেউ যদি মনে করে তার বিশ্বাসের অনুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে, তাহলে তার প্রতিকার আইন ও আলোচনার মাধ্যমে হওয়া উচিত, প্রতিহিংসার মাধ্যমে নয় জাতীয় সম্পদ ধ্বংসের মাধ্যমে নয়। এই নিয়ম সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় তখনই, যখন কোনো সমাজ মনে করে যে শুধু তাদেরই সংযম দেখাতে বলা হচ্ছে, আর অন্যদের ভুল বা উসকানিমূলক বক্তব্য, এমনকী দেশবিরোধী কার্যকলাপও উপেক্ষা করা হচ্ছে। তখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মনে ক্ষোভের জন্ম হচ্ছে। তাই প্রয়োজন এমন একটি পরিবেশ যেখানে আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রযুক্ত হবে এবং কোনো অন্যায়কে রাজনৈতিক বা মজহবি পরিচয়ের ভিত্তিতে আড়াল করা হবে না। পারস্পরিক সম্মান ও সংলাপই হবে সেখানে মাপকাঠি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, যত মত তত পথ। বৈষ্ণব গুণাবলীতে বলা হয়েছে– তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। এই সকল ঐতিহ্য হিন্দু সমাজকে মহান ও উদার করেছে ঠিকই, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, একপক্ষ সহিষ্ণু থাকবে আর অন্যপক্ষ দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করবে, রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকবে। এক্ষেত্রে দেশে শান্তি বিরাজ করতে পারে না। তাই প্রয়োজন ন্যায়ভিত্তিক, সমান আইন— যেখানে সহিষ্ণুতা দুর্বলতা নয়, বরং দেশের প্রতি দায়িত্ববোধের পরিচয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য তখনই সম্ভব, যখন সহিষ্ণুতা হবে সকল পক্ষের। □

সিপিআই(এম) গণতন্ত্রের বুলি আওড়ায়, অথচ ওরাই আমায় পঙ্গু করে দিয়েছে : সদানন্দন মাস্টার

প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য

চৌত্রিশ বছরের বাম জমানা দেখেছে বঙ্গবাসী। ধমকে-চমকে, কখনো-বা গুপ্ত হত্যা করে, ছাপ্পা ভোট দিয়ে বছরের পর বছর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় ঠায় বসেছিল কমিউনিস্টরা। বাম শাসনের সিংহভাগ সময়টাই মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু। পরে রাজ্যের রশি যায় প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হাতে। যে বুদ্ধদেব জ্যোতি বসু সরকারের সমালোচনা করে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন এক সময়, সেই তিনিই আবার ঢোক গিলে দলে সক্রিয় হন এবং মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে পড়েন। সেই পুরো চৌত্রিশ বছরে কত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, কতজনের যে ঠাঁই হয়েছে নিখোঁজের তালিকায়, তার ইয়ত্তা নেই। যেমন হিসেব নেই কেবল ক্ষমতায় টিকে থাকতে কতজনকে যে ভাতে মেরেছে পাশাপাশি পাতেও মেরেছে, বামেরা। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও বামেদের ডান্ডার হাত থেকে রেহাই পাননি। ডান্ডা মেরে তাকে ঠাণ্ডা করতে (পড়ুন, আন্দোলনের কণ্ঠ রোধ করতে) তার মাথায় করা হয়েছিল লাঠির আঘাত। চিকিৎসকদের হাতযশের জোরে সেবার প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাম জমানায় এমন ঘটনা ঘটেছিল আরও অসংখ্য। তবে যেহেতু তারা কেষ্টবিষ্টু কেউ নন, তাই সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে আসতে পারেননি তাঁরা। এই বাম জমানাতেই ঘটেছিল সাঁইবাড়ি, বানতলায়, গড়বেতাকাণ্ড, ছোটো আঙারিয়ার মতো নির্মম ঘটনা। যাদের জন্য এই ঘটনা ঘটেছিল, সিপিএমের সেই মাস্টারমাইন্ডরা আজ নখদন্তহীনভাবে বেঁচে রয়েছেন কোনোক্রমে।

কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়, বামেদের নৃশংস, বর্বরতার ছবি দেখেছে কেরালাও। সেখানেও বাম-সঙ্গ ছেড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের খাতায় নাম লেখানোয় এক মাস্টারমশাইয়ের হাঁটু থেকে দু'টি পা-ই কেটে নিয়েছিল কমিউনিস্টরা। সেই বামেরাই যখন গণতন্ত্রের বুলি আওড়ায়, পুনরায় ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখে বিভিন্ন রাজ্যে কিংবা কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি করে পায়ের নীচের হারানো জমির খোঁজ করে, তখন অলক্ষ্যে নিশ্চয়ই হাসতে থাকেন বিধাতা। এ তো গেল বাম অপশাসনের নান্দীমুখ পর্ব। এবার ফেরা যাক মূল খবরে, যে কারণের জেরে সম্প্রতি ফের খবরের শিরনামে চলে এসেছে কাস্তে-হাতুড়ির দল। এবং সমগ্র দেশে প্রায় একঘরে হয়ে যাওয়া একটি দলকে কাঠগড়ায় তুলেছেন প্রথম জীবনে বামপন্থায় বিশ্বাস করা এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাস্টারমশাই। গত ২ ফেব্রুয়ারি, রাজ্যসভায় বছর তিরিশ আগের সেই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বামেদের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিলেন কেরালার সেই মাস্টারমশাই। রাজ্যসভার সদস্য সদানন্দন মাস্টার বলেন, 'বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি গণতন্ত্র, বাক্‌স্বাধীনতা ও সহনশীলতা নিয়ে তাদের আদর্শগত প্রতিপক্ষদের প্রায়ই নীতিকথা শোনায়। কিন্তু বাস্তবে তারা নিজেরা যে কথা বলে, তা কোনো ক্ষেত্রেই পালন করে না।'

মাস্টারমশাই বর্ণনা করেন, কীভাবে গণতন্ত্র ও সহনশীলতার বুলি আওড়ানো সেই কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী)- সিপিআই(এম)--- তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের কারণেই তিন দশক আগে তাঁর দুই পা কেটে নিয়েছিল। রাজ্যসভার ভেতরে নিজের কৃত্রিম পা দেখিয়ে সাংসদ সদানন্দন মাস্টার বলেন, 'এই দুটোই আমার পা। একসময় আমার শক্ত দু'টি স্বাভাবিক পা ছিল। কিন্তু এখন হাঁটুর নীচে আমি কৃত্রিম পা ব্যবহার করি। কেন? কারণ আমি বারবার এই সংসদে গণতন্ত্রের কথা শুনি— গণতন্ত্র, গণতন্ত্র, গণতন্ত্র। কিন্তু যারা সবচেয়ে বেশি গণতন্ত্রের কথা বলে, তারাই

৩১ বছর আগে আমার ওপর হামলা চালিয়েছিল।' তিনি আরও বলেন, 'কেরালায় সিপিআই(এম)-এর নেতাদের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের কর্মীরা আমায় আক্রমণ করে। আমার বোনের বিয়ে ঠিক হওয়ার পর আমি যখন বাড়ি ফিরছিলাম, বোনের বিয়ে নিয়ে আলোচনা করে ফেরার পথে, একটি বাজারে বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সিপিএমের গুণ্ডারা আমায় ধরে ফলে। তারা পেছন থেকে ধরে আমায় রাস্তায় ফেলে দেয় এবং আমার দু'পা কেটে নেয়। আমি যখন যন্ত্রণায় চিৎকার করছি, তখন তারা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগান দিচ্ছিল। তারা তাদের গণতন্ত্রের কথাই চিৎকার করে বলছিল।' সিপিআই (এম)-এর ভণ্ডামি তুলে ধরে রাজ্যসভার ওই সাংসদ কমিউনিস্টদের উদ্দেশে বলেন, 'আমি এখানে এগুলো (কৃত্রিম পা) দেখাচ্ছি, কারণ আপনাদের অসহিষ্ণুতাকে দেশের সামনে তুলে ধরতে চাই।

আমি দেশবাসীকে দেখাতে চাই, সংসদ সদস্যদের দেখাতে চাই, গণতন্ত্র আসলে কী। আপনারা (সিপিআইএম) সব সময় গণতন্ত্রের কথা বলেন, সহনশীলতার কথা বলেন, মানবতার কথা বলেন, অথচ আপনাদের রাজনীতি দাঁড়িয়ে আছে রাজনৈতিক হিংসার ওপর। শুধুমাত্র, কেবল শুধুমাত্র হিংসা গণতন্ত্রের পক্ষে কখনোই শুভ ফলদায়ী নয়।' সদানন্দন মাস্টারের এই কৃত্রিম পা প্রদর্শনে ক্ষুব্ধ হয়ে সিপিআই (এম) সাংসদ জন ব্রিটাস সংসদের বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে 'পয়েন্ট অব অর্ডার' তোলেন। তবে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণন তাঁকে জানান, তাঁর দলের সাংসদরা যখন সংসদে প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন, তখনও একই ধরনের কড়াকড়ি করা উচিত। ১৯৯৪ সালে সদানন্দন মাস্টারের বয়স ছিল ৩০ বছর। তিনি তখন কেরালার মাট্টানুর পুরসভার পেরিঞ্চেরিতে সরকার-অনুদানপ্রাপ্ত কুঝিক্কাল লোয়ার প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। 'মাশ' নামে পরিচিত সদানন্দন কমিউনিস্ট পরিবার থেকেই উঠে এসেছিলেন। তাঁর বাবা সিপিএমের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং তাঁর দাদা জেলাস্তরে ছাত্র সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন।

সদানন্দন নিজেও ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এসএফআইয়ের সক্রিয় সদস্য ছিলেন, যদিও স্কুলজীবন থেকেই তিনি সঙ্ঘের শাখায় যুক্ত হয়ে পড়েন। স্নাতক পর্যায়ে তাঁকে কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি আকর্ষণের চেষ্টা হলেও, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক জাতীয়তার ধারণা তাঁর মধ্যে রয়ে গিয়েছে। মালয়ালম কবি আক্কিখামের লেখা 'ভারত দর্শনঙ্গল' প্রবন্ধই তাঁর জীবনে মোড় ঘুরে যায়। ১৯৮৪ সালেই সদানন্দন মাস্টার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। কমিউনিস্ট আদর্শ ছেড়ে সঙ্ঘের দিকে ঝোঁকাটা কমিউনিস্টরা মেনে নিতে পারেনি। প্রথমে সিপিআই(এম) নেতা-কর্মীরা তাঁকে সঙ্ঘ ছেড়ে কমিউনিস্ট দলে ফেরার জন্য চাপ দিতে থাকে। তিনি তা করতে অস্বীকার করলে তারা বের করে তাদের দাঁত-নখ, বেছে নেয় হিংসার পথ।

১৯৯৪ সালের ২৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায়, বোনের বিয়ের প্রস্তুতি নিয়ে মাস্টার যখন তাঁর কাকার বাড়ি থেকে ফিরছিলেন, সেই সময় বাস থেকে নামতেই কয়েকজন তাঁকে পেছন থেকে ধরে মাটিতে ফেলে দেয়। মারধর করতে থাকে নির্মমভাবে। সিপিআই (এম)-এর এই গুন্ডারা মাস্টারকে শুধু মারধর করেই রণে ভঙ্গ দেয়নি, তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে তাঁর দুই পা কেটে নেয়। এই বর্বরতা চালানো হয়েছিল তাঁকে 'শাস্তি' দেওয়ার পাশাপাশি অন্যদের ভয় দেখাতে, যাতে কেউ কমিউনিস্ট শিবির ছাড়ার সাহস না পায়। মাস্টারের সেদিনকার অবস্থা দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন কেরালার সিপিএমের অনেক হেভিওয়েট নেতাও। সদানন্দন মাস্টার কিন্তু ভেঙে পড়েননি। বরং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ছাড়ার বা কমিউনিস্ট দলে ফেরার বদলে তিনি দেশ ও জাতির সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করেন।

২০১৬ সালে তিনি বিজেপির টিকিটে কুখুপারাম্বা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সাহস ও আদর্শগত দৃঢ়তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানান। সদানন্দন কেরালায় ন্যাশনাল টিচার্স ইউনিয়নের রাজ্য সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি তিনি 'দেশীয় অধ্যাপক বার্তা' পত্রিকার সম্পাদক এবং সঙ্ঘ ঘনিষ্ঠ চিন্তাচর্চা প্রতিষ্ঠান ভারতীয় বিচার কেন্দ্রমের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

২০২৫ সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁকে রাজ্যসভায় মনোনীত করেন। কেরালার ত্রিশূর থেকে রাজ্যসভা পর্যন্ত তাঁর দুর্গম যাত্রাপথে পড়ে থাকা যে কাঁটার ওপর দিয়ে তিনি হেঁটে এসেছেন, তা তাঁর সাহসের প্রতীক। তিনি আজও জীবন্ত উদাহরণ, কীভাবে কমিউনিস্ট অসহিষ্ণুতা কেবল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেই নয়, গণতন্ত্রকেও পঙ্গু করে দেয়।

কমিউনিস্টরা শুধু রাজনৈতিক হিংসাই লিপ্ত নয়, বরং সেই অপরাধীদের 'নায়ক' হিসেবেও তুলে ধরে। ২০২৫ সালের আগস্টে সদানন্দন মাস্টারের ওপর হামলার দায়ে দোষী সাব্যস্ত আটজন সিপিআই(এম) কর্মীকে দলটি আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা প্রদান করে। খালাসেরি সেশন আদালতের বাইরে এবং পরে মাট্টানুরে দোষীদের মালা পরানো, স্লোগান দেওয়া ও উল্লাসের দৃশ্য সাধারণ মানুষের মনে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এই নৈতিক অধঃপতনের দৃশ্য ঘটেছিল মাট্টানুরের বিধায়ক ও প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে শৈলজার উপস্থিতিতেই।

সদানন্দন মাস্টার কমিউনিস্ট হিংসার শিকার হয়েও বেঁচে আছেন, সিপিআই (এম)-এর ইতিহাসে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও দলত্যাগীদের নৃশংসভাবে দমন করার জীবন্ত দলিল হিসেবে। গত কয়েক দশকে কেরালায় কমিউনিস্ট ক্যাডারদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন বহু বিজেপির নেতা-কর্মী এবং সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। নিখোঁজও হয়েছেন অনেকে। যাঁদের ফেরার প্রতীক্ষায় এখনও দিন গুনছে তাঁদের পরিবার। স্বামীর মঙ্গল কামনায় লাল সিঁদুরে আজও প্রতিদিন সিঁথি রাঙিয়ে তোলেন কেরালার বহু অখ্যাত গাঁয়ের বধূ। এর পরেও কি বলা যাবে, মাস্টারমশাই আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি? □

নৈরাজ্যের অবসান হবে

গত ২ ফেব্রুয়ারি স্বস্তিকার সম্পাদকীয়তে ‘এই নৈরাজ্যের অবসান কবে?’ বিষয়টি সঠিক ও উপযুক্ত। ২০২৬-এর নির্বাচনে এই নৈরাজ্যের অবসান পশ্চিমবঙ্গে হতে চলেছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত। কার্শিয়াং থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ২০২৬-এর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন। পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত সানতনী সমাজের মানুষ বুঝতে পারছেন ২০২৬-এর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গ ‘পশ্চিম বাংলাদেশ’-এ পরিণত হবে, তাই সমগ্র সনাতনী সমাজের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে ২৬-এর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করবেন এ ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত।

—**তুষার নায়ক,**
সিমলাপাল, বাঁকুড়া।

ব্যাপার জিহাদ : বাজার দখলের নীরব যুদ্ধ

‘ব্যাপার জিহাদ’— এটা শুধু কোনো মজহবি তত্ত্ব নয়, এটা একটি অর্থনৈতিক কৌশলের নাম। যে কৌশলের লক্ষ্য বাজার, অস্ত্র বিশ্বাস, আর ঢাল পরিচয়। এখানে বন্দুক চলে না, চলে সাইনবোর্ড। এখানে যুদ্ধক্ষেত্র সীমান্ত নয়, বাজার। আর ক্ষয়ক্ষতি হয় সমাজের আস্থায়। এই কৌশলের মূল সূত্র খুব সোজা— যে সমাজে বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসের ছদ্মবেশ নাও। পরিচিত নাম, পরিচিত ভাষা, পরিচিত সংস্কৃতির প্রতীক— সব ব্যবহার করো, কিন্তু নিজের প্রকৃত পরিচয় আড়ালে রাখো। ফলে ক্রেতা ভাবে আপনজনের দোকান, অথচ বাস্তবে সে দাঁড়িয়ে থাকে এক মুখোশ-পরিহিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামনে। এটিই ‘ব্যাপার জিহাদ’-এর অর্থনৈতিক ব্যবহার— বিশ্বাসকে পুঁজি করে বাজার দখল।

সমস্যা এখানে নামের নয়, সমস্যা স্বচ্ছতার অনুপস্থিতি। ব্যবসা যদি সৎ হয়, তবে পরিচয় লুকোতে হবে কেন? লাইসেন্স, মালিকানা, ট্রেড রেকর্ড— সব যদি পরিষ্কার হয়, তবে সাংস্কৃতিক মুখোশের দরকার পড়ে না। মুখোশের প্রয়োজন পড়ে তখনই, যখন কোথাও আইন ও নৈতিকতার ফাঁক আছে। আরও উদ্বেগজনক যে অভিযোগ উঠে আসছে, তা হলো— এই মুখোশ-নির্ভর ব্যবসায়িক মডেলের সঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী নেটওয়ার্কের একটি অংশের যোগসূত্র। সীমান্ত পেরিয়ে আসা কিছু আইনভঙ্গকারীর চক্র দ্রুত মুনাফার জন্য পরিচয় আড়াল করে, স্থানীয় সংস্কৃতির ছায়ায় ব্যবসা জাঁকিয়ে বসছে— এমন অভিযোগ প্রশাসনের নীরবতাকে আরও প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এখানে প্রশ্ন বিশ্বাসের নয়, প্রশ্ন দেশের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার।

এই অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের ফল ভয়াবহ। প্রথমত, উপভোক্তার বিশ্বাস ভাঙে, আর বিশ্বাস ভাঙলে বাজার ভাঙে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সৎ ব্যবসায়ীরা অসম প্রতিযোগিতায় ধাক্কা খান। তৃতীয়ত, সমাজে সন্দেহ জন্ম নেয়, সহাবস্থানের জায়গায় ঢুকে পড়ে অবিশ্বাস। রাষ্ট্রবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব সন্তু শিকদারের বক্তব্যে তাই আবেগ নয়, যুক্তিই মুখ্য— পরিচয় গোপন মানেই প্রশ্ন। বিজেপি নেতা দেবর্ষি বিশ্বাস প্রশাসনিক জবাবদিহির কথাই সামনে আনেন— ট্রেড লাইসেন্স, সাইনবোর্ড, মালিকানার নথি— সব কিছুর কড়া যাচাই চাই। রাষ্ট্রবাদী চিন্তাবিদ জগন্নাথ মণ্ডল সতর্ক করেন, অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ উপেক্ষা করলে তা শেষ পর্যন্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশে রূপ নেয়। আর হিন্দুত্ববাদী নেতৃত্ব সোনা কুমার দাস স্পষ্ট করে দেন— নীরবতা এখানে নিরপেক্ষতা নয়, নীরবতা অপরাধের নামান্তর।

এই মুহূর্তে সতর্ক হওয়া কেন জরুরি? কারণ মুখোশ-নির্ভর অর্থনীতি যদি স্বাভাবিক হয়ে যায়, তবে আইন কেবল কাগজে বেঁচে থাকবে। তখন দেশ থাকবে মানচিত্রে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ থাকবে না বাস্তবে। এই অবস্থার একমাত্র প্রতিষেধক— আপোশহীন প্রশাসন, কঠোর আইন প্রয়োগ এবং সচেতন নাগরিক অবস্থান। এই প্রেক্ষাপটে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন নিছক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা নয়। এটি হিন্দু সমাজ ও হিন্দুত্বের স্বার্থে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা, সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা এবং দেশের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। ভোট এখানে ঘৃণার হাতিয়ার নয়; এটা আস্থার লড়াই। আর সেই লড়াইয়ে নিরপেক্ষ থাকা মানেই হার। বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের একটা বড়ো অংশ ব্যাপার জিহাদকে সামনে রেখে রাজ্যের হিন্দুদের ব্যবসাকে গিলে খাচ্ছে। এখনই হিন্দুরা যদি সচেতন না হয় তাহলে আগামী দিন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলেই ভবিষ্যৎ সংকেত পাঠাচ্ছে।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
কলেজ রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা।

পরিবর্তনের পক্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গবাসী

গত ৫ ফেব্রুয়ারি গোটা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন চ্যানেলে দেখানো হলো— ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাড়ায় উচ্ছ্বাস মহিলাদের’। সেখানে আবির খেলা, ব্যান্ড তাসা সহযোগে নৃত্য পরিবেশনের যে দৃশ্য সকলেই দেখলাম, সেটা কি স্বতঃস্ফূর্ত! নাকি ভয় দেখিয়ে, কাজের টোপ দিয়ে, পৌরসভার বিভিন্ন অস্থায়ী পদে কর্মরতদের যেভাবে বাধ্য করা হয় জনসভায় ভিড় বাড়ানোর জন্য, মিটিং মিছিলে হলঘর ভরানোর জন্য সেভাবেই তাদের বাধ্য করা হয়েছে? ২০২৬-এর নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্যে তৃণমূলের প্রধান পন্থাই হলো বারে বারে একটা মিথ্যাকে সত্যি হিসেবে পাবলিকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা। যাতে একটা সময় পরে মানুষ মিথ্যাকেই সত্যি হিসেবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। ছোটোবেলায় একটা গল্প পড়েছিলাম, যে গল্পটা সকলেরই কম-বেশি জানা— এক ধনী ব্যক্তি যজ্ঞের জন্য এক ব্রাহ্মণকে একটি নধর ছাগল উপহার দেন। ব্রাহ্মণ ছাগলটিকে কাঁধে নিয়ে বাড়ির পথে চলতে শুরু করেন। পথে তিন ঠগ ব্রাহ্মণের ছাগলটি নিয়ে নেবার পরিকল্পনা করে। তারা আলাদা জায়গায় লুকিয়ে থেকে একে একে এসে ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করে, ‘কেন একটি কুকুরকে কাঁধে নিয়ে যাচ্ছেন?’

ফঃ ৩

ব্রাহ্মণ প্রথমে প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তিনজন ভিন্ন ব্যক্তি একই কথা বলায় তিনি সন্দেহ করতে শুরু করেন যে এটি ছাগল নয়, কুকুর। বিভ্রান্ত হয়ে ব্রাহ্মণ ছাগলটিকে রাস্তায় ফেলে দেন এবং দ্রুত স্নান করে ঘরে ফিরে যান। তিন ঠগ আনন্দ করে ছাগল কেটে মোচ্ছব করে।

আইপ্যাক নামক ছলনাকারী সংস্থাটির কাজই হলো মানুষের মগজটাকে ঘুরিয়ে খেলা ঘুরিয়ে দেওয়া। আর নাটকে ওস্তাদ জননেত্রী তো আছেনই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের মা-বোনেরা লোভী নন। তাই পশ্চিমবঙ্গের মায়েদের অপমান করবেন না কেউ। শুধু ভাতার লোভে তাঁরা তৃণমূলকে ভোট দিচ্ছে না বা দেবে না। এসআইআর ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর যে ভূমিকা আর তাকে নিয়ে মিডিয়া, তৃণমূলি ডিজিটাল যোদ্ধাদের যে ঢক্কানিনাদ তাতে তাদের দুরভিসন্ধি প্রমাণিত হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যে নোংরামি, ছলের আশ্রয় নিয়েছে সেটাকে মানুষের সামনে পালটা তুলে ধরাই প্রধান পন্থা। ওদের জুতোতে পা না গলিয়ে বা ওদের পাতা ফাঁদে পা না দিয়ে আমাদের বিচক্ষণতার সঙ্গে মানুষের কাছে সত্যটাকে তুলে ধরতে হবে। ওদের মিথ্যার বেড়াজাল ছিন্ন করতে হবে। মানুষ পরিবর্তন চাইছেন।

—অতনু দাস,
আখিরাপাড়া, বালুরঘাট।

ইতিহাস বিকৃতির ইতিহাস

সত্যিই। আমরা ভারতের 'ইতিহাস বিকৃতির ইতিহাস'ই পড়েছি। এজন্যই বলা হয়, 'ভারতের যদি কোনো ইতিহাস থাকে, তা হলো বিদেশি আক্রমণকারীদের সামনে নতজানু হবার ইতিহাস। কারণ ৭০০ বছরের সুলতানি ও মুঘল শাসন এবং ২০০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসই পড়েছি। তার আগের ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ইচ্ছেকৃত ভাবে খুব একটা পড়ানো হয়নি। এটাই গ্লানিকর নির্মম সত্য।

খুব কমই কাগজে কলমে লিখিত আকারে থাকে। যেমন--- বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। তারপর রাজারাজড়াদের নিজেদের বংশাবলী অথবা জীবন চরিত। আর আছে মাটি খুঁড়ে পাওয়া জিনিসপত্র। একে বলে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। এর মধ্যে আছে মুদ্রা। আছে সিলমোহর, শিলালিপি, সৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ। আবার কখনো কখনো মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে আসে বহু যুগের পুরনো গ্রাম-নগর। যেমন বেরিয়েছিল সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদাড়ো। কিংবা পশ্চিম পঞ্জাবের হরপ্পায়। তবে ভারতের ইতিহাসে আমরা পাই বিভিন্ন বিদেশি পর্যটকদের লেখা থেকে, পাই তৎকালীন বিশ্বপ্রসিদ্ধ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি ছাত্রদের লেখা থেকে, পাই কার্বন ১৪ পদ্ধতির মাধ্যমে বয়স নির্ণয়ের মাধ্যমে, বিভিন্ন শিলালিপির মাধ্যমে। পাই গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এবং গ্রিক চিকিৎসক টেসিয়াসের বর্ণনা থেকে যা তাঁরা বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের মুখ থেকে শুনে শুনে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখেছিলেন। গ্রিক প্রথম ঐতিহাসিক হেরোডোটাস, যিনি ইতিহাসে সত্যি বর্ণনায় বিশ্বাসী ছিলেন।

তাছাড়া বিবরণ পাওয়া যায় গ্রিস দেশের দূত মেগাস্থিনিসের বর্ণনায়। এছাড়া পাই খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে চীন দেশ থেকে আসা সু-মা কিয়েন-এর বর্ণনা থেকে। তাঁকে বলা হয় চীন দেশের ইতিহাসের জনক। আরও পাই দুই চীনা ভ্রমণকারী ফা হিয়েন ও হিয়েন সাঙের বর্ণনা থেকে। এরপর অষ্টম শতাব্দীতে আরব দেশ থেকে আসা আলবেরুনি, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালি থেকে আসা মার্কোপোলো। আফ্রিকা থেকে চতুর্দশ শতাব্দীতে আসা ইবন বতুতা, পঞ্চদশ শতাব্দীতে চীন দেশ থেকে আসা মা হুয়ান, ইতালি থেকে আসা নিকলো কন্টই, পারস্য থেকে আসা আব্দুর রজ্জাক, রুশ দেশ থেকে আসা অ্যাথেনেসিয়াস নিকিতিন, পর্তুগাল থেকে আসা পায়েজ আর নুনিজ। তারপর মুগল প্রশাসনকালে রালফ ফিচ, টমাস রো, তেভার্নিয়ে, বর্নিয়ে, মানুচি। এরা প্রত্যেকেই ভিন্ন দেশের মানুষ। কিন্তু ভালোবেসেছিলেন ভারতবর্ষকে। যেমন মেগাস্থিনিসের লেখা 'ইন্ডিকা', ফা-হিয়েনের লেখা 'ফো-কুয়ো-কি', ইবন বতুতার লেখা 'রেহালা' অর্থাৎ ভ্রমণ কাহিনি, তারপর আল-বেরুনির ১৮০টি লিখিত বইয়ের মধ্যে অন্যতম 'ভারত তত্ত্ব'। এই 'ভারত তত্ত্ব'তে রয়েছে ৮০টি অধ্যায়। তাতে রয়েছে ভারতবর্ষের ধর্ম, সাহিত্য, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, শ্রেণীভেদ, স্বর্গ-নরকের ধারণা, জন্মান্তরবাদ, মূর্তিপূজা, বর্ণমালা, গ্রহ-নক্ষত্র, মরু-পর্বত, ব্রত উপবাস, আইন আদালত, চন্দ্র- সূর্যের গ্রহণ প্রভৃতি।

খুব প্রাচীনকালে যে কটা দেশে সভ্যতার আলো ফুটেছিল প্রথম, ভারতবর্ষ তাদের একটি। এদেশের মহামানব বুদ্ধের বাণী কান পেতে শুনেছিল পৃথিবী। আর্যভট্ট ভারতবর্ষেরই মানুষ। পঞ্চম শতাব্দীতে তিনিই প্রথম বলেছিলেন, পৃথিবী ঘোরে বলেই এমন পরিবর্তন ঘটে দিন আর রাত্রিতে। নিউটনের পাঁচশো বছর আগে ভাস্করাচার্য জানিয়েছিলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা। গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা আর সৃষ্টিতত্ত্বের বিজ্ঞান ভারতবর্ষের কাছ থেকেই পৃথিবী নিয়েছে হাত পেতে। এখানেই প্রথম সোনা আবিষ্কার। এখানেই প্রথম লোহা গলানো, ইস্পাতের অস্ত্র, কাচের জিনিস বানানো। গাছপালা থেকে প্রথম ওষুধ। প্রথম গণনা পদ্ধতি। আর প্রথম শূন্যের আবিষ্কার। আসলে দেশের স্বাধীনতার পর জওহরলাল নেহরু ও আবুল কালাম আজাদের অপচেষ্টায় ভারতের ইতিহাস রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অপচেষ্টায় বিকৃতি করা হয়েছে। আর সেজন্যই ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারকে সরিয়ে অখ্যাত তারাচাঁদকে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস লেখানো হয়েছে, আর গৌরবোজ্জ্বল ভারতের অতীত, সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভারতের ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে রাজা অনঙ্গ সিংহ, রাজা জয় সিংহ, পাঞ্চালরাজ আদিত্য মোহন, চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল, রাজা পরমার্থী দেববর্মণ, রাজা বিজয় সিংহ, রাজা সর্বথাসিদ্ধ কৌশল, রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, রাজা অজাতশত্রু, গৌড়াধিপ মহারাজ শশাঙ্ক প্রভৃতি মহান এবং বীর রাজাদের। এটাই দুর্ভাগৌর। কাজেই ভারতের বিকৃত ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি। নয়তো পশ্চিমবঙ্গের সেভেন-এইট ক্লাসের ইতিহাসের পাঠ্যবইয়ের মতো অবস্থা হবে যেখানে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম জ্বলজ্বল করছে শিল্পের প্রসারের অধ্যায়ে।

—নারায়ণ শঙ্কর দাশ,
ক্ষুদিরামপল্লী, ইসলামপুর,
উ: দিনাজপুর।

ভারতীয় মনীষায় মাতৃত্বের আধ্যাত্মিক যাত্রা

পৃথিবী-মাতা থেকে ভারতমাতা

মৌমিতা বর

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' এই শ্লোকটি ভারতাত্মার এক অনন্ত ঘোষণা। ভারতীয় দৃষ্টিতে 'মা' কেবল একজন নারী নন; তিনি সৃষ্টির মূল উৎস, ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ প্রকাশ, প্রেম ও ত্যাগের পরব্রহ্ম স্বরূপ। এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন।' (স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা পত্র, ১৮৯৪)

মা সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেন, পালন-পোষণ করেন এবং শেষপর্যন্ত নিজের অংশগুলিকেই নিজের মধ্যে বিলীন করে নেন। ঠিক যেমন পৃথিবী— যিনি অন্ন, জল, জীবন ও আশ্রয় দেন, কিন্তু বিনিময়ে কখনো কিছু দাবি করেন না। ভারতীয় মনীষায় মাতৃত্বকে কেবল জৈবিক বা সামাজিক ঘটনা হিসেবে দেখা হয়নি; একে দেখা হয়েছে এক গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বরূপে, যা সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্বের ভিত্তি। তাই ভারতীয় চেতনায় মাতৃত্বের যাত্রা শুরু হয় পৃথিবীমাতা থেকে এবং তা গিয়ে পৌঁছায় ভারতমাতায়— যেখানে করুণা, শক্তি, ত্যাগ ও ধর্ম একত্রে মিলিত হয়।

ভারতীয় সমাজে মাতৃত্ব কেবল পারিবারিক সম্পর্ক নয়; তা সমগ্র সৃষ্টির এক মহাসূত্র। ভারতীয় দৃষ্টিতে মা কোনো নির্দিষ্ট জৈবিক সম্পর্ক নন, বরং এক সার্বজনীন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, যেখানে প্রতিটি সত্তার মধ্যেই 'মা'-এর দর্শন ঘটে। উপনিষদ বলে, 'মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা সকলের মধ্যেই একই আত্মা বিরাজমান।' তাই এখানে মা কোনো ব্যক্তি নন; তিনি একটি নীতি, একটি শক্তি, একটি আশীর্বাদময় উপস্থিতি। মহাভারতে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেন, 'মাতা গুরুতরা ভূমেঃ'— মা পৃথিবীর থেকেও অধিক পূজ্য। মনুস্মৃতির অমর বাণী— 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ (মনু ৩.৫৬) এই সত্যেরই সাক্ষ্য দেয় যে, যেখানে নারী, মাতৃত্ব ও করুণার সম্মান হয়, সেখানেই দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সত্যকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন— ধরিত্রী আমাদের মা, আমারা তার কোলে শান্তি পাই।' তাঁর মতে মাতৃত্ব কেবল জন্মদান নয়, আশ্রয় দেওয়ার শক্তি। প্রকৃতির প্রতিটি উপহার— বায়ু, জল, রোদ, ছায়া সবই যেন মায়ের কোলে আশ্রয়ের মতো।

ভারতীয় চেতনায় মাতৃত্ব প্রকৃতিকে পালনশক্তি, মানুষকে কৃতজ্ঞ সন্তান এবং দেবত্বকে অনন্ত করুণার সূত্রে আবদ্ধ করে এক আধ্যাত্মিক সেতু গড়ে তোলে। এই মাতৃভাবের কারণেই ভারত বিশ্বকে কেবল 'জগৎ' হিসেবে দেখনি, বরং দেখছে 'জগজ্জননীর বিশাল পরিবার' হিসেবে।

বৈদিক ঋষিরা পৃথিবীকে 'মাতা' বলেছেন এবং নিজেদের 'পুত্র'। অথর্ববেদের অমর ঘোষণা— 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোহহং পৃথিব্যাঃ' (অথর্ববেদ ১২.১.১২)। এটি কেবল কাব্য নয়; এটি সেই চিরন্তন অনুভূতির প্রকাশ, যেখানে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে পৃথিবীর সঙ্গে এক জীবন্ত, স্পন্দিত ও করুণাময় বন্ধনে আবদ্ধ অনুভব করে। ভারতীয় পরম্পরায় পৃথিবী কখনো জড় বস্তু নয়, তিনি চেতন সত্তা— সহনশীল, ক্ষমাশীল ও অনন্ত পোষণশক্তিতে পরিপূর্ণ। তিনি আমাদের ধারিণী, ধৈর্যের প্রতীক, জননী। এই কারণেই অর্থববেদের ভূমিসূক্তে পৃথিবী-মাতার বারবার বন্দনা করা হয়েছে, যিনি সকল প্রাণীকে ধারণ করেন, তাঁকে প্রণাম। এটি কেবল ভক্তি নয়; এটি ভারতীয় পরিবেশ- দর্শনের মৌলিক সূত্র, যেখানে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা কেবল পরিবেশগত দায়িত্ব নয়, আত্মার আধ্যাত্মিক স্পন্দন।

এই মাতৃত্ব কোনো জাগতিক সম্পর্ক নয়; এটি এক দিব্য আধ্যাত্মিক বন্ধন। ধারণ, পোষণ ও ক্ষমা— এই তিন ধারায় গঠিত এই ত্রিবেণী ভারতীয় জীবনদর্শনের মূল স্রোত। পৃথিবী-মাতা আমাদের জন্য অন্ন উৎপন্ন করেন, আশ্রয় দেন এবং নীরব করুণায় আমাদের বহন করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'মা আদর্শ গুণরাজির প্রতিনিধি।' মা কেবল স্নেহের উৎস নন; তিনি সত্য, করুণা, ধৈর্য্য ক্ষমা ও ত্যাগ— সমস্ত নৈতিকতার ভিত্তি। উপনিষদ এই মাতৃত্বকে ব্রহ্মের সৃজনশক্তি হিসেবে আরও উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে স্থাপন করেছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের নির্দেশ— 'মাতৃদেবো ভব' এটি কেবল নৈতিক উপদেশ নয়, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে— 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' (৬.২.৩)। ব্রহ্ম যখন বহু রূপে প্রকাশের সংকল্প করলেন, সেই মুহূর্তেই মাতৃত্বের প্রথম স্পন্দন জন্ম নিল। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন— 'মা ঈশ্বরের গতিশীল দিব্য স্বরূপ।' অর্থাৎ মাতৃত্বই সেই শক্তি, যার অভাবে সৃষ্টি গতিহীন। এই ধারায় দেবীর ধারণার উদ্ভব ঘটে। দেবীমাহাত্ম্যে বলা হয়েছে 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা...'। দেবী সর্বত্র-প্রতিটি প্রাণে, প্রতিটি কণায় মাতৃত্বরূপে বিরাজমান। এই মাতৃত্বই অন্নপূর্ণা, দুর্গা, কালী ও সরস্বতীর রূপ ধারণ করেছে। তাই বলা হয়েছে, 'শক্তিহীনঃ শিবঃ শবঃ।'

ভারতীয় সমাজ মাতৃত্বকে কেবল মানব সম্পর্কের সীমায় রাখেনি; এটি এক বিস্তৃত জীবনদর্শন, যা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে আপন করে নেয়। এই চেতনায় মাতৃত্ব মানুষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গোমাতা, গঙ্গামাতা ও পৃথিবীমাতার রূপ ধারণ করেছে। গোমাতা নিঃস্বার্থ পোষণ ও করুণার প্রতীক— বিনিময়ের প্রত্যাশা ছাড়াই তিনি মানবসমাজকে লালন করেন এবং ত্যাগ ও মমতার আদর্শ স্থাপন করেন। গঙ্গামাতা শুদ্ধি ও ক্ষমার ধারারূপে অবিরাম প্রবাহিত হয়ে মানুষকে আত্মশুদ্ধির পথে আহ্বান জানান; তাঁর মাতৃত্ব স্থবির নয়, তা উদার ও গতিশীল। আর পৃথিবীমাতা হলেন ধৈর্য, ধারণশক্তি ও সহনশীলতার প্রতিমূর্তি— মানুষের সীমাহীন লোভ, আঘাত ও অবহেলা সত্ত্বেও তিনি নীরবে সব বহন করেন এবং তাঁর বুকেই জন্ম নেয় অন্ন, আশ্রয় ও সভ্যতা। □

পা ও পায়ের পাতায় লুকিয়ে থাকে অজানা রোগের ইঙ্গিত

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

আমাদের শরীরে বড়ো কোনো অসুস্থতা হঠাৎ করে আঘাত হানে না। তার আগেই শরীর নানাভাবে সতর্কবার্তা দেয়— নীরব সংকেত পাঠায়, যা আমরা প্রায়ই অগ্রাহ্য করি। সেই ইঙ্গিতগুলো বুঝে সময়মতো ব্যবস্থা নিতে পারলেই এড়ানো যায় বড়ো বিপদ। শরীর সবসময়ই আমাদের সঙ্গে কথা বলে, শুধু তার ভাষা বোঝায় ক্ষমতাটুকু প্রয়োজন। তাই পায়ের দিকে নজর রাখুন। সামান্য পরিবর্তনও হতে পারে বড়ো অসুস্থতার পূর্বাভাস। সময় মতো চিকিৎসা নিলেই এড়ানো সম্ভব ভয়াবহ পরিণতি।

শরীরের নীচের অংশ, বিশেষ করে পা ও পায়ের পাতা— অনেক সময়ই হৃদযন্ত্র, কিডনি বা রক্তসঞ্চালনজনিত সমস্যার প্রাথমিক ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ এসব লক্ষণকে সাধারণ ক্লান্তি বা বয়সজনিত পরিবর্তন ভেবে এড়িয়ে যান। অথচ সময়মতো নজর দিলে এই সামান্য ইঙ্গিতগুলোই দীর্ঘমেয়াদে জীবন রক্ষা করতে পারে।

চিকিৎসক সুদের মতে, পায়ের ত্বক, শিরা বা রঙের পরিবর্তন শরীরের ভেতরে কী ঘটছে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয়। নীচে এমন কিছু লক্ষণের ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো, যা অবহেলা না করাই ভালো।

ফুলে ওঠা বা বেঁকে যাওয়া নীলচে শিরা : এগুলোই সাধারণত ভ্যারিকোজ ভেইন বা শিরা ফুলে যাওয়া রোগের লক্ষণ। রক্ত চলাচলে বাধা বা শিরার ভাল্‌ভ দুর্বল হয়ে গেলে এ সমস্যা দেখা দেয়। পায়ের ত্বকের নীচে নীলচে বা বেঁকে যাওয়া দাগ হিসেবে এগুলো চোখে পড়ে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় এটি 'সি-২ স্টেজ' ভ্যারিকোজ ভেইন ডিজিজ হিসেবে পরিচিত। চিকিৎসা না করালে ধীরে ধীরে পায়ে ভারি ভাব, ব্যথা এবং ত্বকের রং পরিবর্তনের সমস্যা তৈরি হতে পারে।

দুই পায়ের গোড়ালিতে স্থায়ী ফোলা : দুই পায়ের গোড়ালি একসঙ্গে ফুলে গেলে তা হৃদ্‌যন্ত্র, কিডনি বা লিভারের সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে। অনেক সময় মহিলাদের গর্ভাবস্থাতেও এমন ফোলা দেখা দেয়। রক্ত সঞ্চালন ধীর হয়ে গেলে বা শিরায় চাপ বেড়ে গেলে এ ধরনের ফোলা তৈরি হয়। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা বা বসে থাকার পর যদি ফোলা না কমে, তবে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

পা ঠাণ্ডা ও ফ্যাকাশে হয়ে হাঁটার সময় বাধা : এই লক্ষণটি সাধারণত 'পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজ' (পিএডি)-এর কারণে দেখা দেয়। ধমনি সংকুচিত হয়ে রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হলে পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় ও রং ফ্যাকাশে হয়। হাঁটার সময় বা অল্প দূরত্বে ব্যথা ও ক্র্যাম্প হলে সেটিই এই রোগের ক্লাসিক উপসর্গ। চিকিৎসা না করালে ধীরে ধীরে এটি জটিল আকার নিতে পারে, এমনকী ক্ষত সারতে দেরি হওয়া বা টিস্যু নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

পায়ের পেশি লালচে, গরম ও ফুলে যাওয়া : এক পায়ে পেশি যদি লাল, গরম ও ফোলা দেখা যায়, তবে এটি 'ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস' (ডিভিটি) বা গভীর শিরায় রক্ত জমাট বাঁধার লক্ষণ হতে পারে। সাধারণ উপসর্গ হলো একপাশে ব্যথা, লালচে ভাব ও ফোলা। দীর্ঘ সময় এক অবস্থায় বসে থাকা, আঘাত, ক্যানসার, গর্ভাবস্থা বা বংশগত রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা থাকলে 'ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস'-এর ঝুঁকি বাড়ে। দ্রুত চিকিৎসা না নিলে এটি 'পালমোনারি এম্বোলিজম'-এর মতো প্রাণঘাতী জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

আঙুল বা গোড়ালিতে না সারার ক্ষত : পাতা বা গোড়ালিতে ক্ষত তৈরি হয়ে যদি দীর্ঘদিন না সারে, তাহলে তা উন্নত পর্যায়ের রক্তসঞ্চালনজনিত রোগ বা 'অ্যাডভান্সড পিএডি'-এর লক্ষণ হতে পারে। রক্তপ্রবাহে ঘাটতি থাকলে টিস্যুতে অক্সিজেন পৌঁছায় না, ফলে ক্ষত শুকাতে দেরি হয় ও সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়ে। চিকিৎসা না করালে এমন ক্ষত গ্যাংগ্রিনে পরিণত হতে পারে এবং অঙ্গ হানির ঝুঁকিও থেকে যায়।

পা ফাটার সমস্যা অনেকেরই থাকে। শীতকালে পা, গোড়ালি ফেটে যন্ত্রণা হয়। পায়ের পাতার ত্বক শুষ্ক, খসখসে হয়ে যায়। গোড়ালির কাছে ত্বকে আঁশের মতো ছালও উঠতে পারে। সাধারণত দেখা যায়, এগজিমার সমস্যা থাকলে অথবা ডায়াবেটিস থাকলে বা অ্যাথলেট'স ফুটের কারণে পায়ের পাতায় ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটে শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে যায়। তাই সময় থাকতেই পায়ের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। পায়ের যত্ন মানেই অনেকে ভাবেন সালোঁয় গিয়ে বেশ খরচ করে পেডিকিয়োর করানো। তা কিন্তু নয়। ঠিক যেভাবে ত্বক ও চুলের যত্ন নিচ্ছেন, সে ভাবেই রোজ নিয়ম করে পায়েরও যত্ন নিতে হবে। অভ্যাসটা যদি রোজকার হয়, তাহলে শীত আসুক বা বর্ষা, পা ফাটার সমস্যা কোনো সময়েই হবে না। ডায়াবেটিসের রোগীরাও নিরাপদ থাকবেন। হাইপারগ্লাইসিমিয়া অর্থাৎ রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলে তার প্রভাব পড়ে স্নায়ুর উপরেও। ক্রনিক ডায়াবিটিস রোগীদের পায়ের স্নায়ুর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি পায়ের পেশি, হাড়, ত্বক সবই ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে। সেক্ষেত্রেও পায়ের যত্ন নিতে হবে।

প্রথমে নখের পুরনো নেলপালিশ রিমুভার দিয়ে তুলে ফেলুন। তার পর ঈষদুষ্ণ জলে নুন, শ্যাম্পু মিশিয়ে পা ১০-১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এতে ময়লা ও মৃত কোষ দূর হয়ে যাবে। বেশ কিছুক্ষণ পা জলে ডুলিয়ে রাখার পর, ভালো মানের কোনো স্ক্রাব দিয়ে পায়ের পাতা ঘষে নিন। এতে পায়ের মৃত কোষ উঠে যাবে। পায়ে যদি ট্যান থাকে, তা-ও দূর হবে। স্ক্রাব বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারেন। তার জন্য ওটস, এক চিমটে হলুদ এবং চিনি বা কফি দিয়েও স্ক্রাবার বানিয়ে নিতে পারেন। □

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা আয়োজিত সার্ধশত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গৌরব গান

গত ২৬ জানুয়ারি সংস্কার ভারতী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা এবং কলাজ্যোতি, স্বরসপ্তক, আকাশ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, সহজ পাঠ ও শ্রীনৃত্য নিকেতন আয়োজিত বন্দে মাতরম্ গানের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সার্ধশত কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ গৌরব গানের অনুষ্ঠান রাজপুর ব্লু-স্কাই ক্লাব প্রাঙ্গণে সংস্থার ভাবসঙ্গীতের মাধ্যমে বিকেল চারটায় অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রান্ত সহ সভাপতি অমিতাভ মুখোপাধ্যায় এবং জেলা সভাপতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ওড়িশি নৃত্যসাধিকা মোনালিসা ঘোষ। মঞ্চাসীন অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভারতমাতা ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। সঙ্গীতশিল্পী পাপিয়া ভট্টাচার্যের একক সঙ্গীতের পর শ্রীমুখোপাধ্যায় বন্দে মাতরম্ গানের সাধশতবর্ষ পূর্তি পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এরপর পাপিয়া ভট্টাচার্যের পরিচালনায় সংস্থার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সঙ্গীতগোষ্ঠী, স্বরসপ্তক ও আকাশ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে অর্ধশত কণ্ঠে কয়েকটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। আকাশ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও সহজ পাঠ বিদ্যালয়ের সদস্যদের নৃত্য পরিবেশনের পর সার্ধশত কণ্ঠে, মঞ্চে উপস্থিত পঞ্চাশ জন শিল্পীর সঙ্গে শতাধিক দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বন্দে মাতরম্ গান পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে।

সঙ্ঘশতবর্ষ উপলক্ষ্যে গোয়ালতোড়ে হিন্দু সম্মেলন

সনাতনী ঐক্য মঞ্চের উদ্যোগে গত ১ ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড়ে এক হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল ১০টায় গৈরিক ধ্বজোত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শতকণ্ঠে গীতাপাঠ, সাধুসন্তদের বরণ, শান্তিযজ্ঞ, বজরঙ্গবলী নৃত্য প্রভৃতি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের মেদিনীপুর জেলার বৌদ্ধিক প্রমুখ রাজকুমার দাস, সুমন মহিষ এবং স্বামী সুভাষ ত্রিপাঠী মহারাজ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুকোমল দাস।

গাজোলে সঙ্ঘ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে হিন্দু সম্মেলন

সঙ্ঘ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে মালদহ জেলার গাজোল ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের হিন্দু সম্মেলন গত ২৯ জানুয়ারি সম্পন্ন হলো গাজোল হাই স্কুল ময়দানে। সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন বালুরঘাট ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী বিষ্ণুরূপানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী শ্রীনন্দরূপা মহারাজ। প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদহ নগর সহকার্যবাহ পিন্টু সান্যাল। অনুষ্ঠানের শুরুতে শতকণ্ঠে গীতাপাঠ হয়। গীতাপাঠ পরিচালনা করেন সংস্কৃতভারতীর বোনেরা। তার আগে তাঁরা উপস্থিত অতিথিদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ করে নেন। প্রাস্তাবিক ভাষণ দেন মালদহ জেলা সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ দিলীপ সরকার। এরপর নৃত্য পরিবেশন করেন নৃত্যভারতী ক্রিয়েশনের শিল্পীরা। নৃত্যানুষ্ঠান পরিচালনা করেন এই নৃত্য বিদ্যালয়ের কর্ণধার শ্রীমতী ঈপ্সিতা সিংহ রায়। এরপর ভাষণ রাখেন স্বামী বিষ্ণুরূপানন্দ মহারাজ ও পিন্টু সান্যাল। ভাষণের ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন পরেশ চন্দ্র সরকার। আয়োজন সমিতির সভাপতি ফটিক চন্দ্র মণ্ডলের সমাপ্তি ভাষণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আয়োজন সমিতির সঞ্চালন প্রমুখ ডাঃ নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী। সম্মেলন পরিচালনা করেন আয়োজন সমিতির সম্পাদক পরেশ চন্দ্র সরকার। এরপর ঘাকসোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী বৈবশ্বানন্দ মহারাজ শান্তিযজ্ঞ পরিচালনা করেন।

মালদহ জেলা বইমেলায় সংস্কৃতভারতীর পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র

মালদহ নগরের মালদহ মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১৫ থেকে ২১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় মালদহ জেলা বইমেলা। মেলায় সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে ১৪ নং স্টলে সংস্কৃত পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদহ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক উদয় সরকার, অধ্যাপিকা তনুশ্রী সিংহ, গৌড়বঙ্গ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানিক হালদার, সংস্কৃতভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক জয় সাহা, সংস্কার ভারতীর মালদহ জেলা শাখার সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, সংস্কৃতভারতীর ইংলিশ বাজার সংযোজক কৌশিক সাহা, পুরাতন মালদহের সংযোজক সানুলাল ঠাকুর প্রমুখ।

সঙ্ঘ শতবর্ষে পাটুলীতে হিন্দু সম্মেলন

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা এবং সামাজিক সংহতি স্থাপনের লক্ষ্যে দক্ষিণ কলকাতা বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলী অঞ্চলে গত ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো এক বর্ণাঢ্য 'সনাতনী হিন্দু সম্মেলন'। পাটুলী সনাতন হিন্দু সম্মেলন সমিতির উদ্যোগে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই হিন্দু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী জয়ানন্দ গিরি মহারাজ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ সুব্রত রায়। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে সভাস্থলে এক ভক্তির পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানের স্বাগতভাষণে ড. শেখর রায় হিন্দুধর্মের উদার ও দার্শনিক রূপরেখা তুলে ধরে ঋগ্বেদের 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' মন্ত্রের উল্লেখ করে বলেন, আজকের এই সম্মেলন কেবল একটি সভা নয়, বরং সম্মিলিতভাবে চলার এক অঙ্গীকার। সম্মেলনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বৈদিক শান্তিযজ্ঞ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান যা এলাকার মানুষের মধ্যে উৎসাহের পরিবেশ নির্মাণ করে। এদিন সম্মেলনে আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও কর্মযোগের ওপর আলোকপাত করেন স্বামী নির্গুণানন্দ পুরী, স্বামী শ্রীধরানন্দ পুরী, স্বামী শান্তানন্দ গিরি, স্বামী রামেশ্বর পুরী এবং স্বামী প্রেমানন্দ গিরি। ড. সজল কুমার পালিত এবং স্বস্তিকা পত্রিকার সহ সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডলের বৌদ্ধিক আলোচনা সম্মেলনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। স্বামী গঙ্গাপুরী মহারাজের গীতাপাঠ (তৃতীয় অধ্যায়) এবং শ্রী প্রেমানন্দ সম্প্রদায়ের নামসংকীর্তন উপস্থিত শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে। বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজেশ মিশ্র, অরুণ কুমার রায়, শান্তনু ভট্টাচার্য-সহ পাটুলী সনাতনী হিন্দু সম্মেলন সমিতির সদস্যদের সহযোগিতা এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী সীতেশ ভট্টাচার্য, ডাঃ সুখেন্দু সাঁতরা, ড. জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সুদীপ্ত গুহ এবং ড. দেবাশিস চৌধুরীর উপস্থিতি সম্মেলনকে মহিমান্বিত করে। শান্তিমন্ত্র ও 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। পরিশেষে সুশান্ত চৌধুরী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই সম্মেলন পাটুলী ও বৈষ্ণবঘাটা এলাকার মানুষের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

মালদহ নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোডের সরস্বতী শিশু মন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মালদহ নগরের নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোডের বদ্রীনারায়ণ দাস সরস্বতী শিশু মন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ২৯ জানুয়ারি সাহাপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন সরস্বতী শিশুমন্দিরের পূর্বতন প্রধান আচার্য ভীমচন্দ্র মাহাতো।

প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সাহাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষণ শিক্ষক নিরঞ্জন মুর্মু। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন। ক্রীড়া অনুষ্ঠানের শেষ আকর্ষণ ছিল 'সুন্দর সাজো প্রতিযোগিতা'। তাতে কেউ সেজেছিল লক্ষ্মী, সরস্বতী, রানি লক্ষ্মীবাঈ, কেউ-বা সেজেছিল দেশভক্ত সৈনিক ইত্যাদি।

সঙ্ঘ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে হাওড়ার শিবপুরে সনাতন ধর্ম সম্মেলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গত ১৮ জানুয়ারি হাওড়া শিবপুর মন্দিরতলায় কেশবনগর সমিতির উদ্যোগে এক বিরাট হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজারামতলা শঙ্করাচার্য মঠের অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ, বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাঃ উদয়ন সান্যাল এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রচার প্রমুখ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী। প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত 'হে পার্থসারথী বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ' পরিবেশন করেন তনুশ্রী মল্লিক। এরপর স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ সনাতন হিন্দুধর্মের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী দেশের ও রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করে হিন্দুদের সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান।

দ্বিতীয় পর্বে পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরিচালনা করেন সংস্কার ভারতী হাওড়া শাখা এবং বনবাসী কল্যাণ আশ্রম শিবপুর সমিতির শিল্পীরা। গীতার দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ করেন শ্রীমতী মুনমুন রায়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমতী ধীশ্বরী নাগ। কল্যাণ মন্ত্রোচ্চারণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা হয়। পরিশেষে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মেদিনীপুরে নিবেদিতা সেবা ট্রাস্ট ও সনাতন সমাজের উদ্যোগে বিশ্বশান্তি যজ্ঞানুষ্ঠান ও সহস্র কণ্ঠে গীতাপাঠ

গত ৩০ জানুয়ারি মেদিনীপুর শহরের মণ্ডল মাঠে বিশ্বশান্তি যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অঞ্জলি সিনহা, নিবেদিতা সেবা ট্রাস্টের সভাপতি দেবকুমার পণ্ডা, সম্পাদক কৌশিক মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ওমপ্রকাশ রায়, মনোজ খাজাঞ্চি, জগদীশ ঘোষ, রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখ। পতঞ্জলি পরিবারের সদস্য-সদস্যারা এই যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। যজ্ঞের পর স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজের বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে ভাষণ শুরু হয়।

এরপর সহস্র কণ্ঠে গীতাপাঠ শুরু হয়। গীতাপাঠ পরিচালনা করে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ৪০জন ছাত্র-ছাত্রী।

এপিসি রায় মেধা অন্বেষণ অভীক্ষায় উত্তীর্ণদের পুরস্কার বিতরণ

১১ জানুয়ারি কলকাতা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে এপিসি রায় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সহযোগিতায় 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মেধা অন্বেষণ অভীক্ষা-২০২৫'-এর রাজ্যস্তরের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হয়। গত বছরের ২৪ আগস্ট রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বহু পরীক্ষাকেন্দ্রে চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টমশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। সেই পরীক্ষায় কৃতীদের উৎসাহিত করতে জেলাভিত্তিক পুরস্কার আগেই প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু রাজ্যস্তরে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের জন্য এই বিশেষ আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্য ও জেলাস্তরের বিভিন্ন কার্যকর্তা, পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক- অভিভাবিকা এবং সমাজের গুণী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ফাউন্ডেশনের সম্পাদক বিদ্যুৎ মজুমদার জানান, গত বছর ২৪ আগস্ট বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মোট দু'ঘণ্টার এই পরীক্ষাতে রাজ্যের ১৯টি জেলার ১০৩টি পরীক্ষাকেন্দ্রে ১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা প্রশ্ন তৈরি ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়াও এপিসি ফাউন্ডেশন ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতির সুবিধার্থে গত ১৮ ডিসেম্বর রাজ্যজুড়ে প্রতিটি জেলায় মাধ্যমিক প্রস্তুতি অভীক্ষার আয়োজন করেছিল। সেখানেও ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। দেশের সর্ববৃহৎ অরাজনৈতিক শিক্ষক সংগঠন ABRSM এই অভীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি থেকে সমস্ত ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করে আসছেন। ফাউন্ডেশনের সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল বলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে ২০২৩ সাল থেকে এই সংগঠন কাজ করে চলেছে। চতুর্থ, অষ্টম ও দশমশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের ভিত মজবুত করার লক্ষ্যে এরকম অভীক্ষা ব্যবস্থা আগামীদিনে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে করা হবে বলেও তিনি জানান। ABRSM-এর সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক বলেন, গত কয়েক বছর থেকেই এপিসি রায় ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় আমরা এরকম পরীক্ষা চালিয়ে আসছি। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জেলায় ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে এই পরীক্ষা নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ অনুভব করা যাচ্ছে। আশা করছি, আগামীদিনে এপিসি রায় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে আরও বিভিন্ন রকম কার্যক্রমে আমাদের সংগঠন সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

শিহড় গ্রামে গ্রাম বিকাশ পুঞ্জের সভাপতি শ্যামাপদ ঘোষের বাড়িতে নামসংকীর্তন অনুষ্ঠানের অধিবাসের দিন গ্রাম বিকাশ যোজনার উদ্যোগে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জয়রামবাটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গ্রাম বিকাশ পুঞ্জের সভাপতি মহোদয় গ্রামের স্বামীজী শিশু সংস্কার কেন্দ্রের ভাই-বোন-সহ এবং ২০ জন দুঃস্থ মহিলাকে নিজ বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনে আপ্যায়িত করেন।

ফঃ ৪

ত্রিবেণী কুম্ভ বিষয়ক আলোচনাচক্র 'বঙ্গীয় শক্তি সঙ্গম-২০২৬'

'মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে / আমরা বাঙ্গালি বাস করি সেই তীর্থে বরদে বঙ্গে'— কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার মধ্যে দিয়ে এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মুক্তধারায় ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করতে বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার ভক্ত মানুষ ছুটে আসেন। কীসের আশায়? বিষয়টি বুঝতে হবে সবাইকে আসতেই হবে ত্রিবেণী সঙ্গমে, বঙ্গ কুম্ভ মহোৎসবে।

শাস্ত্রে ত্রিবেণীকে উত্তর ও দক্ষিণ দু'টি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রয়াগরাজ হলো উত্তর ত্রিবেণী। কথিত যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মা এই স্থানে প্রথম যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তাই এই স্থানকে 'তীর্থরাজ' বলা হয়। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর পুণ্য ধারার এই সঙ্গমের দক্ষিণ প্রান্ত হলো হুগলী জেলার ত্রিবেণী তীর্থ। ত্রিবেণীকে শুধুমাত্র তিনটি নদীর সঙ্গমস্থল রূপে চিহ্নিত করা যায় না। বরং বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে ত্রিবেণীকে বঙ্গের শক্তিকেন্দ্র রূপেই চিহ্নিত করা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে বীরাচারী সাধকদের সিদ্ধিলাভ করার স্থল এই ত্রিবেণী। শৈব, বৈষ্ণব ও শক্তি সাধনার পুণ্যভূমিতেই খুঁজে পাওয়া যায় কুম্ভ মিলনোৎসব। মহাভারতের বনপর্বে, স্মার্ত রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, বিভিন্ন শৈব ও বৈষ্ণব শাস্ত্র ও কাব্যে এই কুম্ভস্নান পরম্পরার উল্লেখ রয়েছে।

বঙ্গভূমি প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের শক্তি জাগরণের কেন্দ্র। অন্তত ১২টি স্থানে দেবী সতীর দেহাংশ পড়ায় ভারতবর্ষের শক্তিপীঠের অধিকাংশই বঙ্গভূমিতে। এর বাইরেও রয়েছে আরও কয়েকটি সিদ্ধপীঠস্থান। এক অজানা রহস্যে এই স্থানের ধূলিকণার স্পর্শে সাধক সিদ্ধ হন। মৃতসঞ্জীবনী সুধায় প্রেমানন্দে নেচে ওঠে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়।

প্রায় ৭০০ বছর পর সম্প্রতি হুগলী জেলার এই ত্রিবেণী তীর্থে মাঘী সংক্রান্তি তিথিতে বার্ষিক কুম্ভস্নান পুনরুদ্ধার হলো বাঙ্গালির পুনরুজ্জীবনের নতুন একটি অধ্যায়। গত ১৫ জানুয়ারি এই ঘোষণাই হলো কলকাতায় ভারতীয় যাদুঘরের স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জন্মশতবার্ষিকী সভাগৃহে। এদিন মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম স্মার্টের উদ্যোগে এবং ভারতীয় যাদুঘরের সহযোগিতায় আয়োজিত হয় 'বঙ্গীয় শক্তি সঙ্গম-২০২৬'— শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান। এ বছর মাঘী সংক্রান্তি তিথিকে কেন্দ্র করে মাঘ মাসের ২৮, ২৯ ও ৩০ তারিখ, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ বঙ্গীয় ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালনা সমিতির ব্যবস্থাপনায় কুম্ভ মহোৎসব পুনর্জাগরণের পঞ্চম বর্ষের আয়োজন চলছে ত্রিবেণী তীর্থে।

এদিনের অনুষ্ঠানে রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ নির্গুণানন্দজী মহারাজ উৎসবের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনন্দ আখাড়ার যোগী কালিকানন্দ সরস্বতী মহারাজ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ আচার্য সঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ, লোক ভবনের চিফ অফ স্টাফ (সিওএস) ড. এসকে পট্টনায়েক, ভারতীয় যাদুঘরের অধিকর্তা ড. সায়ন ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক ড. রাকেশ দাশ, ভারতীয় যাদুঘরের বোর্ড অফ ট্রাস্টির সদস্যা ড. শতরূপা প্রমুখ বিশিষ্টজন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রবীর ভট্টাচার্য্য।

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু স্মরণ

গত ২১ জানুয়ারি মহাজাতি সদনে বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির উদ্যোগে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর প্রয়াণ দিবস পালিত হয়। এদিন মহাবিপ্লবী স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক তথা বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের পৌত্র তরুণ বিশ্বাস, মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ভাইঝি ইন্দ্রাণী বসু, রাসবিহারী বসুর নাতি পার্থসারথি বসু, রাসবিহারী রিসার্চ ব্যুরোর সম্পাদক তপন ভট্টাচার্য, বিপ্লবী প্রফুল্ল কুমার সেনের কন্যা ড. পূরবী সেন, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত, বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সাধারণ সম্পাদক গোপাল চক্রবর্তী, বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা স্মারক সমিতির সম্পাদক সুবীর সাহা, বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রবধূ মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, ভারত সভার সদস্য সুব্রত সরকার এবং বিপ্লবতীর্থ চন্দননগরের 'চন্দননগর ইয়ং কালচারাল সোসাইটি'র সম্পাদক অনিল কুমার ঘোষ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে প্রায় সকলেই বক্তব্য রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গোপাল চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস।

শ্যামনগরে 'বঙ্গধ্বনি' পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ১ ফেব্রুয়ারি, পবিত্র মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগরে পূবালী পিকনিক গার্ডেনে আয়োজিত হয় 'রাষ্ট্রবাদীদের বার্ষিক মিলনোৎসব-২০২৬'। প্রায় দ্বিশতাধিক মানুষ এদিনের এই মিলনোৎসবে যোগ দেন। সবরকম বিভেদ ঘুচিয়ে রাষ্ট্রবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করার এই উৎসবের অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে এদিন প্রকাশিত হয় 'বঙ্গধ্বনি' পত্রিকা। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রটির '১৮ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ'-এর প্রথম সংস্করণটির আবরণ উন্মোচন করেন ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য অসীম সরকার, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সুদীপ্ত গুহ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. অরিন্দম ভট্টাচার্য্য, বিশিষ্ট নাট্যকার ও সাংবাদিক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ অনুশীলন সমিতির কর্ণধার সুভাষ গুহ, দ্য নিউজ বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের কর্ণধার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মানব গুহ, বইবন্ধু প্রকাশনীর কর্ণধার শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, 'পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ আয়োজন কেন্দ্রীয় সমিতি'র সদস্য ও বিশিষ্ট আইনজীবী ব্রজেন রায় এবং পণ্ডিত রামকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য। পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন দেবজ্যোতি চক্রবর্তী এবং সার্কুলেশন-সহ পত্রিকাটির বাণিজ্যিক বিষয় ও প্রচার-প্রসারের দায়িত্বে রয়েছেন সন্দীপ মুখোপাধ্যায়। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে ওপার ও এপার বঙ্গে বাঙ্গালিদের শোচনীয় অবস্থার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে সমস্ত রাষ্ট্রবাদী মানুষকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে গুরুত্বদানের বিষয়টি তাঁরা তুলে ধরেন। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন যে, আগামীদিনে সমগ্র বঙ্গভূমির রাষ্ট্রবাদীদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবে 'বঙ্গধ্বনি'। পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দেবজ্যোতি চক্রবর্তী। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান এবং পারস্পরিক আড্ডা ও আলাপচারিতার পর মিলনোৎসবে উপস্থিত সকলে একত্রে বনভোজনে মিলিত হন।

তারকেশ্বরে সামাজিক সমরসতার জীবন্ত উদাহরণ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষকে সামনে রেখে যে পঞ্চ পরিবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার একটি হলো সামাজিক সমরসতা অর্থাৎ ভেদাভেদহীন সমাজ নির্মাণ। এই ধারণার মূল লক্ষ্য হলো সমাজ-মনে দীর্ঘদিন ধরে গেঁথে থাকা বিভাজনের কুপ্রথাগুলোর সমূলে উৎপাটন করা এবং সমানতা, সহাবস্থান ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার বার্তাকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করা। এই ভাবনা কেবল কোনো ঘোষণা বা শ্লোগানে সীমাবদ্ধ মধ্যে নয়, বরং এটি বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করার একটি ধারাবাহিক প্রয়াস।

কয়েকদিন আগে তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের তারকেশ্বর জেলার সহ জেলা কার্যবাহ অরূপ কুমার চক্রবর্তী। গত ৩ ফেব্রুয়ারি তিনি তাঁর পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মতো এক পারলৌকিক কাজে সামাজিক সমরসতার যে বার্তা তুলে ধরেছেন তা নিঃসন্দেহে সমাজের সামনে এক নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

সমাজের প্রচলিত রীতি অনুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণভোজনের নিয়ম। শতাব্দী প্রাচীন এই রীতির পেছনে কোনো কারণ থাকলেও এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ দেখা গেল— ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিবর্তে অনুষ্ঠিত হলো শিশুভোজন। এই শিশুভোজনে অংশগ্রহণকারী শিশুরা ছিল তথাকথিত জাতি ও সামাজিক পটভূমি থেকে আগত। কোনো বিভাজন, কোনো উচ্চ-নীচের রেখা সেখানে টানা হয়নি। শাস্ত্রেও বলা হয়েছে, শিশুদের মধ্যে দেবতারা বাস করেন। সেই ভাবনাকেই বাস্তবে রূপ দিয়ে এই উদ্যোগ যেন মনে করিয়ে দিল, মানবতার আসল পরিচয় কোনো জাতিভিত্তিক নয়, বরং সহানুভূতি ও সমতার চেতনায়।

আজ যখন সমাজকে ভাঙার নানা অপচেষ্টা চারদিকে সক্রিয়, তখন এমন একটি উদাহরণ সকলকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। সমতা কোনো স্লোগানে আসে না, আসে নিজের জীবনাচরণে। সঙ্ঘের শতবর্ষে সামাজিক সমরসতা যদি সত্যিই সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তবে এই ধরনের নীরব অথচ শক্তিশালী উদ্যোগই তার প্রকৃত ভিত্তি রচনা করতে পারবে।

সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে নাগরিক সম্মেলন

গত ২ ফেব্রুয়ারি মালদা জেলার গাজোল বাংলা বেল্ট হলে সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক সম্মেলন। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন সংস্কৃতভারতীর গাজোলের অধ্যক্ষ শ্রীকান্ত বৈদ্য। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীনান্টু বালা। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন সংস্কৃতভারতীর অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ শ্রীশ দেবপূজারী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতভারতীর পূর্বক্ষেত্র সংগঠনমন্ত্রী প্রণব নন্দ। প্রধান বক্তা 'সংস্কার-সংস্কৃতি-সংস্কৃত' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন সংস্কৃতভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রমুখ শ্রীমতী তাপসী মণ্ডল। বন্দে মাতরম্ গীতের পর সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

শিবরাত্রি
মহামিলনের রাত্রি

নন্দলাল ভট্টাচার্য

মহাশিব রাত্রি :

শিবরাত্রি। মহাশিবরাত্রি। হিন্দুধর্ম সাধনার ধারায় এ এক রূপাতীত অনুষ্ঠান। প্রতি মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীই শিবরাত্রি। কিন্তু ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দশী চিহ্নিত মহাশিবরাত্রি হিসেবে। প্রতি কৃষ্ণপক্ষের শিবরাত্রি নয়, ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দশীর এই মহা শিবরাত্রিই পালন করেন বেশিরভাগ মানুষ। এমনকী শিবরাত্রি বললেও এই দিনটিকেই বোঝায়।

নানা কারণেই এই শিবরাত্রি বা মহাশিবরাত্রি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। হিন্দুর বেশিরভাগ পূজা-অনুষ্ঠানই হয় মূলত শুক্লপক্ষে। বেশিরভাগ অনুষ্ঠানই হয় দিনের বেলায়, খুব বেশি হলে প্রদোষে। অল্প যে দু-একটি অনুষ্ঠান হয় কৃষ্ণপক্ষে ও রাত্রে শিবরাত্রি তারই একটি। পূজা-অনুষ্ঠান নিয়ে রাত্রি জাগরণের বিধি রয়েছে অল্প যে কয়েকটি ক্ষেত্রে, শিবরাত্রি তারও একটি। তাই-বা কেন, শিবরাত্রির পূজা অনুষ্ঠান হয় সারারাত ধরে প্রহরে প্রহরে। এমনটি কিন্তু কালীপূজার ক্ষেত্রেও দেখা যায় না। সেখানে তিথি নক্ষত্র মেনে পূজা গভীর রাতে শুরু হলেও তার মধ্যে থাকে না কোনো বিরতি। টানা চলে পূজা। শিবরাত্রির ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটি হয় না। এখানে রাতের চার প্রহরে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে পূজা করতে হয় আলাদা উপচারে আলাদা আলাদাভাবে।

আঁধারেই পূর্ণতা :

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা মনে করেন, অমানিশার দীপান্বিতা কালীপূজা— অন্য অর্থে আলোর উৎসব। শিবরাত্রি কিন্তু তার বিপরীত। এখানে বরং আঁধারের মধ্যেই চলে অন্তর্নিহিত সত্যের অন্বেষণ। অথবা আঁধারেই শুরু সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ হবার সাধনা। আঁধারের সঙ্গে মিললেই সেই সাধনা পায় পূর্ণতা।

তাই-বা কেন, এই অন্ধকারের কোনো উৎস নেই। আলো উৎসারিত হয় কোনো-না-কোনো উৎস থেকে। আলোকে আড়াল করা যায়, আঁধারের কিন্তু কোনো অন্তরাল নেই। তীব্র যে সূর্যের আলো, দু'হাতে চোখ ঢেকে তাকে আড়াল করা যায়, কিন্তু সেই আড়ালের মুহূর্তেও দেখা যায় ছায়া। আর ছায়া তো আঁধারেরই একটি রূপ। সে কারণেই আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন মানুষরা বলেন আঁধারই সত্য। শাশ্বত।

একথা তো ভারতীয় শাস্ত্রে, বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থে বারবার উক্ত। সৃষ্টির সেই আদি মুহূর্তে যখন ছিল না কিছুই, ছিল না জল বা জীবন, এমনকী আলোও। ব্রহ্মাণ্ড তখন আবৃত ছিল শুধুই ঘন অন্ধকারের আবরণে। তারপর স্রষ্টার অন্তরে জাগল সৃষ্টির ইচ্ছা। আর তাতেই জীবনের উন্মেষ ঘটল সেই আঁধারেই। এই ব্রহ্মাণ্ডে আঁধারই সত্য— এমনটাই বলে থাকেন অধ্যাত্মবিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, আঁধার নামে শূন্যতা, পূর্ণতাও সেটাই।

বিজ্ঞানেও বলা হয় এই একই কথা। মহাকাল বা মহাবিশ্বে দৃশ্যমান কেবলই আঁধার। সেই আঁধারের পটভূমিতেই মিটিমিটি আলোর বিচ্ছুরণ নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে। আর এই যে মহাজাগতিক অন্ধকার, তা কিন্তু কেবলই শূন্য— এ শূন্যতার সীমা নেই। এ শূন্যতা অসীম-অনন্ত। এই অন্ধকার বা শূন্যতার মধ্যেই

সবকিছুর সৃষ্টি। বিনাশও এই অন্ধকারেই।

জ্ঞানের প্রতীক :

মহাশিবরাত্রি হলো একটি আধ্যাত্মিক রাত্রি। এ রাত্রিতে শিব থাকেন বিনিদ্র। এ রাত্রি দূর করে অজ্ঞানতাকে। অন্য অর্থে এটি হলো জ্ঞানের প্রতীক।

ভগবান শিবের এই উন্নিদ্র রাত হলো জীবের জীবনে বিনাশ ও জন্মান্তরের মধ্যের সেই সূক্ষ্মতম ব্যবধানের মুহূর্ত। এটি হলো ক্ষয় বা বিলয় থেকে উত্তরণ যাত্রার সূচনাকাল। শিবরাত্রির এই জাগরণ তাই মহাজাগরণের রাত— মহামিলনেরও রাত। এই রাতে সমস্ত জাগতিক কোলাহল কামনা ভুলে মনকে অন্তর্মুখী করে শিব সাযুজ্যলাভে ধ্যান মগ্ন হতে হয়।

পৌরাণিক পর্যবেক্ষণে মহাশিবরাত্রি হলো শিবের নানা লীলা স্মরণের মুহূর্ত। কোনো কোনো পুরাণে বলা হয়, এই শিবরাত্রির ক্ষণেই মহাদেব মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের তাণ্ডব নর্তনে লীলায়িত হন।

সমুদ্র মন্থনের এই রাতেই শেষনাগের হলাহলে বিশ্বচরাচর হয় হতচেতন। সেই সংকটের মুহূর্তে শিব দু'হাতের অঞ্জলিতে সেই হলাহল ধারণ করে পান করেছিলেন সৃষ্টিকে সজীব রাখার জন্য।

আবার কোনো কোনো পুরাণ মতে সতীর দেহত্যাগের পর শিব এই দিনই বিয়ে করেছিলেন হিমালয় নন্দিনী রূপে জাত দেবী মহামায়া পার্বতীকে। আর ওই কারণেই শৈব সাধকদের কাছে এটি হলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি রাত।

জীবনবোধ জাগানো রাত :

শিবরাত্রি সম্পর্কে আছে নানা পৌরাণিক কাহিনি। সেসব কাহিনির কোনো কোনোটিতে রয়েছে এই দিনটির মাহাত্ম্যের কথা। শিবরাত্রির চার প্রহরে উপবাসী থেকে শিবপূজা করলে অতি পাপাচারীও মৃত্যুর পর পায় শিবলোকে স্থান।

অন্যদিকে এই দিনটি সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনির যেসব তথ্য বা তত্ত্ব উঠে এসেছে তার থেকে বলা যায়। শিবরাত্রি হলো এই মহাবিশ্বের এক প্রতীকী রাত্রি। অধ্যাত্মবিজ্ঞানীরা মনে করেন, শিবরাত্রি হলো অন্ধকার বিনাশ হওয়ার রাত। অহংবোধ দূর হলেই মানুষ নিজের স্বরূপ সম্পর্কে হয় সচেতন। সেই সচেতনতার মুহূর্তে মানুষ হয় অন্তর্মুখী। হয় ধ্যানমগ্ন। তীব্র হয় পরমের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা।

শাস্ত্রমতে, এই রাত হলো শিব ও শক্তির মিলনের রাত। সেই মিলনের ফলেই বিনাশের মধ্যেও বহমান থাকে সৃষ্টির অবিরাম ধারা। এই রাতে উপবাস, পূজা, নামকীর্তন ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে একটি সুশৃঙ্খল একটি জীবনযাপনের অভ্যাস। সনিষ্ঠ জীবন রূপান্তরিত হয় সুন্দর থেকে সুন্দরতরে। সৎ ও সত্যের এই উপাসনার মধ্য দিয়েই মানুষ খুঁজে পায় এক মহৎ জীবনযাপনের পথ। বস্তুত, স্কন্দ, লিঙ্গ, পদ্ম বা অন্যান্য শৈবপুরাণে শিবরাত্রি সম্পর্কিত সব কাহিনিতেই রয়েছে আধ্যাত্মিক জীবনবোধ জাগ্রত করার কথা।

ধ্যানের রাত্রি :

শিবরাত্রি— শিবের উৎসব। এই রাতে করা হয় শিবের অর্চনা নানাভাবে। এই দিনটির সঙ্গে ভগবান শিব জড়িয়ে রয়েছেন নানা ভাবে। এ সম্পর্কে যেসব কাহিনি রয়েছে তার প্রতিটিরই মুখ্য চরিত্র শিব। তাঁর মাহাত্ম্যের কারণেই দিনটি সমগ্র হিন্দু সমাজের কাছেই হয়ে আছে বিশেষ তাৎপর্যবহ।

অধ্যাত্ম্যবিজ্ঞানীরা বলেন, শিবরাত্রি হলো বিশেষ ধ্যানের রাত্রি। এই রাতে বা তিথিতে শিবের ধ্যান করলে ভক্ত অন্তরে পান অপার আনন্দ আর পরিণতিতে পান শিবের কৃপা। তাই শিবরাত্রির রাতকে ধ্যানানন্দের রাত বলেও চিহ্নিত করেন কেউ কেউ।

শিবরাত্রিকে ধ্যানের রাত্রি বলার কারণে শাস্ত্রজ্ঞরা এই রাতকে সবিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। বলা হয়, এই রাতেই দেবাদিদেব শিবমহেশ্বর কৈলাশ পর্বতে মগ্ন হন গভীর ধ্যানে। বিচরণ তখন তাঁর জ্ঞানাতীত লোকে। কৈলাস পর্বতের মতোই তিনি তখন অচল, অনড়, নিস্পন্দ, স্থির। তুষারধবল কৈলাসে তুষারমৌলি শিব সেদিন এক তুরীয় আনন্দে বিহার করতে থাকেন পরমাশক্তির সঙ্গে।

এই ঘটনার কথা মনে রেখেই বিশেষ করে শৈবসাধকরা মনে করেন, শিবরাত্রির মহিমার কারণেই এই রাতে সহজে ধ্যান বিভোর হওয়া যায় বিমল আনন্দে। আত্মজ্ঞান লাভ হয় সাধকের। সেকারণেই শিবরাত্রি ভক্তদের কাছে এক মহামহিমময় রাত্রি।

জনদেবতা শিব :

শিবরাত্রি— শিবের উৎসব, শিবপূজার রাত্রি। বাইরের আড়ম্বর নয়, সর্বত্যাগী শিবের মতোই তাঁর এই পূজাও অনাড়ম্বর। একটু গঙ্গাজল, দু-চার দানা আতপচাল, চন্দন আর বেলপাতাতেই তুষ্ট আশুতোষ। সাধারণের-জনগণের জনদেবতা শিব। অর্থ নয়, ভক্তির অর্ঘ্যেই তৃপ্ত তিনি। তাই পার্থিব ধনীর চেয়ে নিঃস্ব সাধারণ মানুষই বেশি করে তাঁর করুণা পান। পান সহজেই।

নমঃ শিবায় বলে শিবলিঙ্গে যে অর্চনা করা হয়, সেই শিবলিঙ্গের উদ্ভব সম্পর্কেও রয়েছে নানা কাহিনি। শিবলিঙ্গের উৎস সন্ধানে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার অভিযাত্রা এবং ব্রহ্মার অনৃত ভাষণের কাহিনি সকলেরই জানা। সত্য যেটা, সেই অনাদি অনন্ত জ্যোতির্লিঙ্গের উৎস অথবা অন্ত কোনোটারই সন্ধান পাননি বিষ্ণু ও ব্রহ্মাও।

শিবলিঙ্গের উদ্ভব সম্পর্কে অন্য কাহিনি, তাণ্ডব নৃত্য শেষে মহাদেব নিজেই শিবলিঙ্গ হিসেবে এই মর জগতে স্থিত হন। তারপর থেকেই জগতে

দেবাদিদেবের প্রতীক এই শিবলিঙ্গের অর্চনার প্রচলন ঘটেছে।

পুরুষ ও শক্তি :

শিবরাত্রি পুরুষ ও শক্তির মহামিলনের— পুণ্যলগ্ন। এরাত্রি মিলনের রাত্রি। এরাত্রি আবার ত্যাগের রাত্রি— মুক্তিরও রাত্রি। তাই মুক্তিকামী মানুষ যেমন পালন করেন শিবরাত্রি, তেমনি শিবসম স্বামী পাওয়ার চিরন্তন কামনাতেও কুমারী মেয়েরা পালন করেন শিবরাত্রি। শিব-পার্বতীর পরম মিলন তথা বিবাহের পুণ্যলগ্ন এই শিবরাত্রি এটাই সকলের বিশ্বাস।

কিন্তু শিব ও পার্বতীর এই যে মিলন তা কিন্তু হয়নি সহজে। শিবকে পাওয়ার জন্য পার্বতীকে করতে হয়েছিল কঠোর সাধনা। দিতে হয়েছিল নানা পরীক্ষা।

প্রয়াসে মেলে প্রসাদ :

একইভাবে শিবও প্রস্তুত করেছিলেন নিজেকে দীর্ঘ ধ্যান-তপস্যার মধ্য দিয়ে। শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের আগে এই যে কঠোর সাধনা তার উল্লেখ করে শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন, বিনা তপস্যায় যে কখনোই কিছু হয় না, এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নিত্যসিদ্ধ শিব-পার্বতীকেও করতে হয়েছিল নানা কৃচ্ছ্রসাধনা।

সেই সাধনার মধ্য দিয়েই তাঁরা শোনান ধর্মের মর্মবাণী,— সাধন বিনে রতন মিলে না। পার্থিব অথবা পারমার্থিক যে কামনাই হোক, তা পূরণের জন্য করতে হয় কঠোর সাধনা। প্রয়াসের অনলে জ্বলতে জ্বলতেই এগোতে হয় লক্ষ্যের দিকে— তাতেই আসে সাফল্য। প্রয়াসেই মেলে প্রসাদ।

সতীর স্থূলতনু কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্যের পর একসময় তিনি হন শান্ত। অচল গিরির মতো ধ্যানের গভীরে ডুবে থাকেন। সে যে কতকাল তার কোনো হিসেব নেই। তারপর একদিন কামদেবের মদন বাণে স্বভূমিতে অবতীর্ণ হন তিনি। তারপরই ঘটে মিলন।

অন্যদিকে দক্ষকন্যা সতী জন্ম নেন হিমাচলকন্যা রূপে। চিরকালের কাম্য মহাদেবকে পাওয়ার জন্য শুরু করেন পঞ্চাগ্নি সাধনা। তাঁর সাধনার রূপ দেখে ভীত-বিস্মিত দেবতারাও। বিস্মিত আবার প্রশ্ন মুখরও। সত্যিই নিয়মনিষ্ঠভাবে গৌরী করছেন সাধনা। নিজেকে করছেন পরিশুদ্ধ— দেবাদিদেবকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছেন কি তিনি? এমনই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যই পরীক্ষা করে দেখার প্রলোভন তাড়িত করে তাঁদের। তাই তাঁরা পাঠান সপ্ত ঋষিকে। তাঁরা আসেন, দেখেন, তারপর ফিরে গিয়ে বলেন, পার্বতীর তপস্যার তুলনা নেই ত্রিভুবনে। স্বয়ংসিদ্ধা তিনি।

পরীক্ষা নিরন্তর :

তবু হয় না শিব শক্তির মিলন। শেষ হয় না পরীক্ষাও। এবার পরীক্ষক স্বয়ং শিব। পার্বতীর তপস্যাস্থলের কাছেই ছিল যে স্রোতধারা— সেখানে কুমির রূপে অবস্থান করেন স্বয়ং মহাদেব। তারপর সহসা এক শিশুর আর্তনাদে ভরে ওঠে চারিদিক। ধ্যান ভাঙে পার্বতীর। বিচলিত তিনি। ছুটে যান আর্তনাদের উৎসস্থলের দিকে। দেখেন বিশাল এক কুমির জলের গভীরে টেনে নিয়ে চলেছে এক শিশুকে। আর প্রাণভয়ে কেঁদে চলেছে শিশু। তার আর্ত চিৎকার, বাঁচাও! বাঁচাও!

করুণায় দ্রব পার্বতীর অন্তর। কুমিরকে সানুনয় অনুরোধ,— ছেড়ে দাও ওকে।

কুমির বলে, ছাড়তে পারি একটি শর্তে। পার্বতী জানতে চান কুমিরের শর্ত। কুমির বলে, তুমি যদি তোমার তপস্যার ফল আমাকে দাও, তাহলেই ছেড়ে দেব একে।

মুহূর্তের জন্যও চিন্তা নয়। পার্বতী বলেন, রাজি আমি, তুমি কেবল ছেড়ে দাও ওকে। পরার্থে নিজের তপস্যার ফল দিয়ে দিতে চেয়ে এক বিরল নির্দশন সৃষ্টি করলেন পার্বতী। স্বরূপে দেখা দিয়ে সেকথাই বলেন মহাদেব। এরপর আর কথা নয়। ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দশীতে বিবাহের মধ্য দিয়ে এক হয়ে গেলেন হর-পার্বতী। শিবরাত্রি তাই পুরুষ ও প্রকৃতির মহামিলনেরও রাত্রি। □

লুপ্ত তীর্থ পুনরুদ্ধার তীর্থক্ষেত্র ত্রিবেণী

পল্লব মণ্ডল

ধর্মীয় অর্থে তীর্থস্থান বলতে বোঝায় যে স্থানে দেবতার পূজা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় এবং যে স্থানে গেলে মানুষ শান্তি পায়। বঙ্গদেশের গঙ্গাসাগরের সমসাময়িক আরেক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হলো সুহ্মক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত সপ্তগ্রামের ত্রিবেণীধাম। হুগলি জেলার গঙ্গাতীরে ২২°৫৮'১০'' উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮°২৬'৪০" পূর্ব দ্রাঘিমায় এই স্থান অবস্থিত।

তবে বঙ্গেও একসময়ে কুম্ভমেলা প্রচলিত ছিল, যার কথা ভুলে গেছে বিগত অনেক প্রজন্ম। বঙ্গে ইসলামি শাসকদের অনুপ্রবেশ ও অত্যাচারের ফলে মুছে যায় ত্রিবেণী কুম্ভের নাম। গঙ্গা-যমুনা- সরস্বতী তিন নদীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণীতে আনুমানিক ১৩১৯ খ্রিস্টাব্দে শেষবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছিল কুম্ভমেলা। ৭০৩ বছর অপেক্ষার পর সাধুসন্তদের প্রচেষ্টায় ২০২২-এ পুনরুদ্ধার হলো বঙ্গের কুম্ভতীর্থ। প্রাচীনকালে এই স্থান ত্রিবেণী নামেও পরিচিত ছিল। স্থানীয় ইতিহাসবিদ অশোক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'ত্রিবেণী কুম্ভমেলার সঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলার একটা যোগ ছিল। এক সময় সাধুসন্তরা গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়ার পর তারা পদব্রজে ত্রিবেণীতে আসতেন। মাঘ সংক্রান্তি অর্থাৎ বিষুব সংক্রান্তির দিন তাঁরা স্নান করতেন। এই দিনটাকেই অনুকুম্ভ হিসেবে ধরা হতো ত্রিবেণীতে। সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী শিক্ষা ও সংস্কৃতির তীর্থভূমি ছিল।' স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী কুশদ্বীপের রাজা প্রিয়ব্রতের মোট সাতজন পুত্র (অগ্নিধ্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিষ্মান, সবন ও ভব্য) ত্রিবেণীধাম সংলগ্ন এই স্থানে সাধনা করে সিদ্ধি করেছিলেন। সংলগ্ন সাতটি গ্রামে যথা বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, নিত্যানন্দপুর, কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর, শিবপুর ও বলদঘাটিতে তারা তাদের আশ্রম তৈরি করেছিলেন। তাই এর নাম সপ্তগ্রাম।

১২৯২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সুলতানির সিপাহসালার জাফর খান গাজি ত্রিবেণী আক্রমণ করলে তার নির্দেশে তুর্কি সেনা ত্রিবেণীতে প্রচুর গণহত্যা চালায়, হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রা বন্ধ করে দেয় এবং ত্রিবেণীর পালযুগে নির্মিত একটি বিষ্ণু মন্দির ভেঙে দেয়। এর পাশাপাশি হিন্দুদের জমায়েত নিষিদ্ধ করে এবং কুম্ভমেলা বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় বর্ধমানভুক্তির মহারাজা ভূদেব রায় ত্রিবেণী পুনরুদ্ধার এবং হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধযাত্রা শুরু করেন। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমার দিন ইটাচুনার কাছে মহানাদের প্রান্তরে রাজা ভূদেব রায় ও জাফর খান গাজির মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মহারাজা ভূদেব রায় দিল্লির সেনাকে পরাস্ত করলে বর্ধমানের হিন্দু সেনা ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম বিজয় করে, ত্রিবেণীধামে পুনরায় হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং পুনরায় কুম্ভমেলা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৫০৫ সালে পাণ্ডুয়ার (মালদা) সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ওড়িশা আক্রমণের জন্য এই অঞ্চল দখল করে বহু মন্দির ধ্বংস করে। সপ্তগ্রামের নাম রাখা হয় 'হুসেনবাদ'। সেই হিন্দুদের জমায়েত নিষিদ্ধ করে ত্রিবেণীর কুম্ভমেলা পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করে।

অবশেষে বহুকাল পর ২০২২ সালে সুদূর আমেরিকা প্রবাসীর বস্টনের অধিবাসী ইতিহাসবিদ, গবেষক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী কাঞ্চন ব্যানার্জি, আমেরিকা নিউইয়র্কের অধিবাসী শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায় এবং ত্রিবেণী বাঁশবেড়িয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী অমিত শা'র তত্ত্বাবধানে পুনরায় এই লুপ্ত তীর্থের পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়, ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালনা সমিতি নামে। পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশের সর্ব পন্থের সাধু-সন্তদের পথনির্দেশনে ও স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে সুসংগঠিতভাবে কুম্ভমেলা ও পুণ্য কুম্ভস্নানের আয়োজন করা হয় ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি মাঘী সংক্রান্তি ভৈমী-একাদশী তিথিতে। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের নাম দেওয়া হয়েছে 'ত্রিবেণী কুম্ভমেলা'।

২০২৩-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি ৯৮তম 'মান কী বাত' অনুষ্ঠানে বঙ্গতীর্থ ত্রিবেণী নিয়েই মনের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিন বছর আগে এই মহোৎসবটির পুনরারম্ভ এবং ৮ লক্ষেরও বেশি ভক্তের সমাগমের কথা উল্লেখ করে আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে সাধুবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা কেবলমাত্র একটি প্রথাকে জীবিত করে তুলছেন তা নয়; বরং ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষাও করছেন'। □

শিব চতুর্দশী বা মহাশিবরাত্রির মাহাত্ম্য উপলব্ধিতেই সাধক হন সিদ্ধ, ভক্ত হন পাপমুক্ত

কানু রঞ্জন দেবনাথ

শিব চতুর্দশী বা মহাশিবরাত্রি হলো দেবাদিদেব মহাদেব শিবের মহারাত্রি। শিব পুরাণ অনুসারে এই রাত্রেই মহাদেব সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মহাতাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন। আবার এই রাত্রেই শিব ও পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল। আবার কারও মতে, এই দিন কালকূট পান করে মহাদেব সৃষ্টি রক্ষা করেছিলেন। ভগবান শিবের মহান রাত্রিকে মহাশিবরাত্রি বলা হয়। প্রত্যেক চান্দ্রমাসের চৌদ্দতম দিন অর্থাৎ অমাবস্যার আগের দিনকে শিবরাত্রি নামে জানা যায়। বছরে শিব রাত্রির সংখ্যা ১২টি। মহাশিবরাত্রি ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের ১৪তম দিনে হয়ে থাকে। অর্থাৎ মহাশিবরাত্রি পালিত হয় পঞ্জিকা অনুসারে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে। অন্ধকার ও অজ্ঞতা দূর করার জন্য এই ব্রত পালন করা হয়। এবার মহাশিবরাত্রি তিথি ১৫ ফেব্রুয়ারি।

একটি ক্যালেন্ডার বছরে আসা সব শিবরাত্রির মধ্যে মহাশিবরাত্রির মাহাত্ম্য সর্বাধিক— এইরূপ মানা হয়ে থাকে— যা ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে আসে। এই রাত্রে পৃথিবী উত্তর গোলার্ধের এমন জায়গায় স্থিত হয় যে মানুষের ভিতর শক্তির প্রাকৃতিক রূপ উপরের দিকে যেতে থাকে। এটি এমন একটি দিন যখন প্রকৃতি মনুষ্যকে তাঁর আধ্যাত্মিক শিখর পর্যন্ত যেতে সাহায্য করে। এই সময়টাকে উপযোগ করার জন্য অধ্যাত্মকামীরা একটি উৎসব পালন করে থাকেন, —যা সম্পূর্ণ রাত্রিব্যাপি চলতে থাকে। এদিন সাধক বা ভক্ত শিরদাঁড়া সোজা রেখে সারারাত ধ্যানমগ্ন থাকেন। মহাশিবরাত্রি শিবের 'সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রি' নামেও পরিচিত। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, মহা শিবরাত্রি উদ্‌যাপন ভক্তদের মনে করিয়ে দেয় যে অহংকার, অহং ও মিথ্যা শুধুমাত্র মানুষকে পতনের দিকে নিয়ে যায়।

মহাশিবরাত্রি হলো সেই মহারাত্রি যা শিব উপাসনার সঙ্গে যুক্ত। এই উৎসব শিবের দৈব অবতারের একটি শুভ উৎসব। নিরাকার থেকে আকারে (অর্থাৎ লিঙ্গে) তাঁর রূপান্তরের রাতকে বলা হয় মহাশিবরাত্রি। তিনি সাধককে কাম, ক্রোধ, লোভ, আসক্তি, হিংসা প্রভৃতি থেকে মুক্ত করেন এবং পরম সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্য দান করেন। এই উৎসবটিকে কাশ্মীর অঞ্চলে 'হর-রাত্রি' বা 'হেরথ' বা 'হেরাথ' বলা হয়।

'লিঙ্গ' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত লিঙ্গম্ শব্দ থেকে,— যার অর্থ হলো প্রতীক বা চিহ্ন। ধ্যানমগ্ন শিবকে এই প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। শিব আত্মধ্যানে স্ব-স্বরূপে লীন থাকেন। আর সাধককেও আত্মমগ্ন বা ধ্যানমগ্ন হতে উপদেশ দেন। 'লয়ং যাতি ইতি লিঙ্গম্'— অর্থাৎ যাঁর মধ্যে সমস্ত কিছু লয় প্রাপ্ত,— তা-ই 'লিঙ্গ'। অন্য এক পুরাণ অনুসারে, মহাশিবরাত্রিতে শিব ও দেবী পার্বতীর মিলন হয়েছিল। ফাল্গুন চতুর্দশী তিথিটি শিব-পার্বতীর বিবাহের আনন্দে মহাশিবরাত্রি পালিত হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, মহাশিবরাত্রির উপবাস, পূজা ও জলাভিষেক বিবাহিত জীবনের সকল প্রকার সমস্যা দূর করে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি আনে। এছাড়াও মহাশিবরাত্রির দিনেই বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ প্রকাশিত হয়েছিল। এই কারণে মহাশিবরাত্রি উৎসব পালিত হয় ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাবের স্মরণে।

শিবরাত্রির ব্রতের মাহাত্ম্য : শিবরাত্রির ব্রতকে শাস্ত্রে মুক্তিবীজ বলা হয়েছে। জ্ঞানেই হোক আর অজ্ঞানেই হোক, এই ব্রত পালন করলে শিব প্রসন্ন হন। যে ব্যক্তি এই ব্রত পালন করেন তিনি পরম পদ লাভ করেন। শরীর, মন ও

ফ ঃ ৫

কথার মধ্য দিয়ে যে সকল পাপ কাজ হতে পারে,— সে সকল এই ব্রতের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এমনিতেই শিব আশুতোষ নামে সুখ্যাত, তদুপরি শিবরাত্রিতে তাঁর করুণাধারা ভক্তের শিরে বর্ষণের অপেক্ষায় সদাই উন্মুখ হয়ে থাকেন। তিনি শিবরাত্রির দিনে অজ্ঞান জীবের প্রতিও করুণা বর্ষণ করে থাকেন করুণাময় শিব।

কথিত, পুরাকালে অবন্তীনগরে একজন সদ্‌বংশজাত, সদাচারসম্পন্ন, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীও সৎ ও পতিব্রতা ও ধর্মপরায়ণ মহিলা ছিলেন। ব্রাহ্মণের দুইজন পুত্র ছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল সুনিধি ও আরেকজনের নাম বেদনিধি। সুনিধি পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু বেদনিধি পণ্ডিত হলেও পতিতা নারীর প্রতি ছিল খুবই আসক্ত। প্রায়ই ওই পতিতালয়ে যেতেন,—সেখানে খাবারও খেতেন। এই কথা তার পিতা জেনে তাকে নিষেধ করলেও সেখানে যাওয়া বন্ধ করেননি। একদিন ওই নগরের রাজা সদ্ ব্রাহ্মণের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে দামি বলয়, আংটি প্রভৃতি গহনা উপহার দিলে ব্রাহ্মণ সেগুলি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গোপনে স্ত্রীর কাছে জমা দেন। তাঁর স্ত্রীও সেগুলি রাখেন। কিন্তু দুষ্ট বেদনিধি সেগুলি রাতে চুরি করে নিয়ে সেগুলি নর্তকীকে দিয়ে দেয়। একদিন যখন সেই নর্তকী রাজার কাছে নৃত্য প্রদর্শন করতে যায়, সেদিন রাজা তার শরীরে সেই দামি অলঙ্কারগুলি দেখতে পান। তখন রাজা নর্তকীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এই গহনাগুলি সে কোথা থেকে পেয়েছে? রাজার ভয়ে বাধ্য হয়ে নর্তকী সব কিছু সত্য ঘটনা রাজাকে বলেন। এই কথা শুনে রাজা এই গহনাগুলি নিজের কাছে রেখে দিয়ে যে ব্রাহ্মণকে তিনি গহনাগুলি দিয়েছিলেন তার কাছ থেকে গহনাগুলি ফেরত চাইলেন। ব্রাহ্মণ বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে গহনাগুলি দিতে বললে ব্রাহ্মণী সেই গহনাগুলি খুঁজে না পেয়ে ব্রাহ্মণকে চুরি হওয়ার কথা বললেন। ব্রাহ্মণও রাজাকে গহনা চুরির কথা বললেন। রাজা তখন এই সত্যি ঘটনা অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছেলে দেবনিধির ঘটনা ব্রাহ্মণকে খুলে বললেন। রাজার মুখে সব শুনে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ তার ব্রাহ্মণী, কুলাঙ্গার পুত্র বেদনিধিকে খুব ভর্ৎসনা করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

পথে যেতে যেতে বেদনিধি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন। সেদিন ছিল শিবরাত্রি। ওই দিনে এক ধনী ব্যক্তি নানান রকমের পূজার দ্রব্য ও নৈবেদ্য নিয়ে শিব মন্দিরে যাচ্ছিলেন। বেদনিধি তা দেখে আনন্দিত হয়ে ভাবতে থাকে— 'আমিও যাব'। —মনে মনে এইরকম চিন্তা করে সে মন্দিরে গিয়ে শিবপূজা দেখতে লাগল। পরে সে ভাবছে— 'ওরা তো কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যাবেন, তারপরে আমি ওইসব প্রসাদ খেয়ে নেব। — এইরকম চিন্তা করতে করতে সে রাত জেগে থাকল। এদিকে অন্যান্য লোকেরা চার প্রহরের পূজা, আরাধনা করে ধ্যানে মগ্ন হয়ে রইল বা ঘুমিয়ে পড়ল। কেউ কেউ আবার বাড়িতে গিয়েও ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকেই আবার মন্দিরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বেদনিধি যখন দেখল সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। সেই সময় প্রদীপগুলি উজ্জ্বল না থাকায় বেদনিধি প্রসাদ ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিল না। বেদনিধি তখন নিজের মাথার পাগড়ি খুলে, তার থেকে কিছুটা কাপড় ছিড়ে নিয়ে আগুনের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে প্রসাদ নিয়ে পালিয়ে গেল। যাওয়ার সময় কারও কারও শরীরে তার পা লাগার ফলে— 'কে-রে, কে-রে' বলে চীৎকার করে উঠল। তখন রাজার দারোয়ানরা তাকে তাড়া করে ছুটে গিয়ে তির নিক্ষেপ করে মেরে ফেলে। এখানে লক্ষণীয় যে শিবরাত্রিতে বেদনিধির শিবপূজা দর্শন, ব্রতপালন এবং জাগরণ সবই হলো। বড়োই দয়ালু শিব, তাই ব্রাহ্মণের সব কাজই শুভ ফল প্রদান করল।

বেদনিধি মারা যাওয়ায় যমদূতেরা এবং মহাবলশালী শিবদূতেরা সেখানে ছুটে এল। দু'দলের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হলো। শিবদূতেরা যমদূতদের বললেন, 'তোমরা দণ্ড নিয়ে এখানে এসেছ কেন?' যমের লোকেরাও শিবদূতদেরকে বলল, 'তোমরা শিবের ভক্ত, তোমরা এখানে এলে কেন? —এই ব্রাহ্মণ সারা জীবন শুধুই পাপ করেছে। বিন্দুমাত্র পুণ্যের কাজ করেনি'। শিবদূতেরা বললেন, 'হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ বহু পাপ করেছে ঠিকই, কিন্তু শিবের ব্রত ও শিবরাত্রিতে জাগরণ করার ফলে তার সারা জীবনের সব পাপ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। আর তার কোনো পাপ নেই। যা ছিল সব নষ্ট হয়ে গেছে'। তখন তারা দু'দলে ঝগড়া করতে করতে যমরাজের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো ন্যায্য বিচার পাওয়ার জন্য। যমরাজ সব শুনে বললেন, 'শিবদূতেরা ঠিক কথাই বলেছেন, তাঁদের কথাই সত্যি। ব্রাহ্মণের সকল পাপ নষ্ট হয়ে গেছে, ভস্মীভূত হয়ে গেছে।' পরে যম শিবদূতদের প্রণাম করলেন এবং ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে বললেন, 'তুমি ভাগ্যবান'। পরজন্মে সেই ব্রাহ্মণ কলিঙ্গ দেশের রাজা হলেন। শিবপূজা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ কলিঙ্গ দেশের রাজা হয়ে নিত্য শিবপূজা করতেন এবং শিবরাত্রি ব্রত করতেন। বলাবাহুল্য, দুরাত্মা ব্রাহ্মণ কোনো চেষ্টা-যত্ন না করেও শিবরাত্রির ব্রত কোনোরকমে করেছেন বলে তার ওই ফল লাভ হলো। যারা পরম ভক্তিভরে এই ব্রত পালন করেন, তারা যে মুক্তিলাভ ঘটবে বা স্বর্গ লাভ হবে তাতে কোনো কিন্তু সন্দেহ নেই। দুষ্ট ব্রাহ্মণ চুরির জন্য প্রদীপের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করেছে, সদ্‌বুদ্ধিতে করেননি। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক শিবরাত্রিতে দীপ প্রদান করেন, তিনি পরমপদ লাভ করেন। এই জন্যই শিবরাত্রির ব্রতের সমান আর কোনো ব্রত নেই, শিবের চেয়ে আর কেউ এমন দয়ালু নেই এবং পরম পবিত্রকারীও নেই। এই ব্রতের চেয়ে আর কোনো উৎকৃষ্ট ব্রতও নেই। কারণ এই ব্রত থেকেই পরম মুক্তি হয়, মানে বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। শিবই জ্ঞান প্রকাশক, শিবই পরম পদ। ভগবান শিবের উপাসনাতেই আসে ঐকান্তিক মুক্তি। □

শিবময় ভারত

শুভদীপ দাস

শিবময় এ সংসার ওরে জীব কি জান না।

প্রকৃতি প্রভাবে শিবে করিছ জীব কল্পনা।

বৈদিককাল থেকে অদ্যাবধি কল্যাণের দেবতা শিব সারা ভারতে সকলের আরাধ্য। তিনি যেমন ত্যাগীর আদর্শ, তেমন গৃহীরও আদর্শ। যোগী ও জ্ঞানীরা তাঁকে অনুসরণ করেন। কিন্তু কে এই শিব— সেকথা জানতে গেলে শিব-শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুধাবন করতে হয়। 'শিবম্ অস্য অস্তি ইতি শিবঃ'— যার মধ্যে সমস্ত মঙ্গল বিদ্যমান তিনিই শিব।

আবার 'শ্যতি অশুভম্ ইতি শিবঃ'— তিনি অশুভ বিনাশ করেন তিনি শিব। 'শেরতে অবতিষ্ঠন্তে অষ্টৌ গুণা অস্মিন্ ইতি শিবঃ'— অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব— এই অষ্টসিদ্ধি যাঁর মধ্যে স্বতঃ বিরাজমান তিনি শিব। পুরাণে শিবের এই অষ্টমূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। এই অষ্টমূর্তি হলেন— রুদ্র, শর্ব, পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, মহাদেব ও ঈশান। শিবের এই অষ্টমূর্তি আসলে আমাদের নিত্য জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁরা হলেন পঞ্চ মহাভূত (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী), চন্দ্র, সূর্য ও যজমান (যজ্ঞকর্তা)। মহাকবি কালিদাস তাঁর কালজয়ী নাটক অভিজ্ঞানশকুন্তলমের মঙ্গলশ্লোকে এই অষ্টমূর্তির ললিত বর্ণনা করেছেন।

দক্ষিণ ভারতীয় শৈব আগমে শিবের পঞ্চবিংশতি (২৫) মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চানন বা পঞ্চমুখ শিবেরও উল্লেখ পাওয়া যায় শৈব আগম ও পুরাণে। বিবিধরূপে বিবিধভাবে বিবিধকালে ভারতবর্ষের বিবিধপ্রান্তে শিবের আরাধনা পরিলক্ষিত হয়। শিবভক্তি আপামর ভারতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক একতার চিহ্ন। ভারতবর্ষ যথার্থই শিবময়।

বৈদিকসাহিত্যে শিব : অনেক অর্বাচীন গবেষক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, শিব আসলে বৈদিক দেবতা নন, তথাকথিত অনার্যদের দ্বারা পূজিত দেবতা তিনি। বিদেশ থেকে আগত আর্যরা শিবকে অধিগ্রহণ করেছেন ইত্যাদি। আর্য আক্রমণ তত্ত্বের মতোই এই ধারণাও সর্বৈব ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। চার বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ ভাগে শিবের উপস্থিতি জাজ্বল্যমান। সেখানে তিনি রুদ্র নামে সমধিক পরিচিত। রুদ্র কোথাও মরুৎগণের পিতা, কোথাও অগ্নি, আবার কোথাও ইন্দ্র রূপেও নিজেকে প্রকাশ করেছেন। দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোক তার বিচরণক্ষেত্র। রুদ্-ধাতুর অর্থ ক্রন্দন। 'রোদয়তি মনুষ্যান্'— এই বিগ্রহে রুদ্রশব্দের নিষ্পত্তি। কারণ তিনি অতি ভীষণ, কোপনস্বভাব, সংহারকর্তা। আবার মহাজ্ঞানী, জমির উর্বরতাবর্ধক, সুখদাতা, বিভিন্ন রোগব্যাধির ঔষধপ্রয়োগকর্তা বৈদ্যরাজ-রূপেও রুদ্রকে আমরা দেখতে পাই। যজুর্বেদে বলা হয়েছে— 'ভেষজমসি, ভেষজং গবেহশ্বায় পুরুষায় ভেষজম্। সুখং মেষায় মেষ্যৈ'— অর্থাৎ হে রুদ্র, তুমি ঔষধস্বরূপ আমাদের সর্ব উপদ্রব নাশ

কর। আমাদের জনগণ, গো, অশ্ব, মেষ প্রভৃতিকে সর্বব্যাধিনিবারক ঔষধ প্রদান কর।

বেদবর্ণিত রুদ্র শ্বেতবর্ণ, জটাধারী, মৃগারোহী, ত্রিশূলধারী। বাজসনেয়ী সংহিতাতে গিরীশ, গিরিত্র, কপর্দী, শিব, শম্ভু, শঙ্কর, পশুপতি প্রভৃতি নামে তিনি বন্দিত। সুতরাং আমাদের আরাধ্য শিব নেহাত অনার্যপূজিত দেবতাকে বলপূর্বক অধিগ্রহণের কাহিনি নয়, বরং আর্য ও অনার্য সমাজের মেলবন্ধনের সেতুস্বরূপ। তিনি নিতান্তই বৈদিক প্রজ্ঞাবান মুনিঋষিদের দ্বারা বন্দিত। আবার বনবাসী, গিরিবাসী সমাজের মধ্যেও আরাধিত।

বৈদিকোত্তরসাহিত্যে শিব : বৈদিককালের মহাপ্রতাপান্বিত সর্বগুণবিভূষিত রুদ্র ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে পৌরাণিক ত্রিমূর্তির অন্যতমরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। জগতের প্রলয়কর্তারূপে তিনি প্রসিদ্ধ। অত্যন্ত অল্পে সন্তুষ্ট হয়ে ভক্তদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। সেই কারণে তিনি আশুতোষ। তিনি শ্মশানবাসী, প্রেত-পিশাচ তাঁর নিত্য সহচর। অন্যান্য দেবতাদের মতো তার বেশভূষায় কোনো আড়ম্বর নেই। রুদ্রাক্ষ, নরকপাল ও বিষধর সর্প তাঁর প্রিয় অলঙ্কার। পশুচর্ম তাঁর বসন। চিতাভস্ম গাত্রভূষণ। ত্রিশূল ও খট্টাঙ্গ তাঁর অস্ত্র। তৈলহীন রুক্ষ জটাজাল তাঁর শিরে শোভিত। শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা শিবকে ঘিরে অগণিত ঘটনার বর্ণনা পাই। পুরাণে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কলহ মেটাতে তাঁর লিঙ্গরূপে অবির্ভাব, দক্ষের অহঙ্কারনাশের জন্য দক্ষযজ্ঞ নাশ, ত্রিপুরাসুরের প্রাসাদে বাণ প্রহার, মদন দহন, রামেশ্বর তীর্থে শ্রীরামচন্দ্র ও দেবী সীতা কর্তৃক শিবের পূজা, কিরাতার্জুন বৃত্তান্তে শিবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজাদের পাশুপত অস্ত্রলাভ প্রভৃতি কাহিনির বিষয়ে আমরা অবগত।

সম্পূর্ণ আগমশাস্ত্রই পার্বতীকে উদ্দেশ্য করে শিবের উপদেশস্বরূপ। পরবর্তীকালে কালিদাস প্রমুখ মহাকবির রচনাতেও শিবের বর্ণনা উপলব্ধ হয়। গ্রন্থকারদের মঙ্গলাচরণে বারবার শিবের স্তুতি দেখতে পাওয়া যায়। ভাগবতে শিব সঙ্গীতাচার্য, নটগুরু। গান, বাজনা, নাচ সবেতেই তিনি পারদর্শী। পাণিনীয় ব্যাকরণের আকর ভূত মাহেশ্বরসূত্র তাঁর ডমরুর ধ্বনি থেকেই উদ্ভূত। চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি গুরুদেব। যোগশাস্ত্রে তিনি যোগীশ্বর। সঙ্গীতশাস্ত্রে গীত, বাদ্য ও নৃত্যের অধীশ্বর নটরাজ। বর্তমানেও কুশীলবরা নটরাজ শিবমূর্তির আরাধনা করে থাকেন।

ভারতে ও বহির্ভারতে শিবমন্দির : মঙ্গলমূর্তি শিব সারা ভারতে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন নানা বিগ্রহে ও লিঙ্গমূর্তিতে। ভারতের প্রতিটি গ্রামে ও শহরে আমরা অজস্র ছোটো-বড়ো শিবমন্দির দেখতে পাই। যে সমস্ত শিবলিঙ্গ ভারতে ও বহির্ভারতে দেখা যায় তাদের মধ্যে কোনটি স্বয়ম্ভু, কোনটি স্থাপিত, কোনটি বাণলিঙ্গ। আদি শঙ্করাচার্য তার পরিব্রাজক জীবনে সে সমস্ত স্বয়ম্ভু লিঙ্গের বিশেষ দর্শন করে বিশেষ অনুভূতি লাভ করেছিলেন সেই বারোটি লিঙ্গ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। হিমালয়ের কেদারখণ্ডে **কেদারনাথ,** সৌরাষ্ট্রে সমুদ্রতীরে **সোমনাথ,** দ্বারকা সমীপে **নাগেশ্বর,** কাশীতে **বিশ্বনাথ,** নাসিকের কাছে গোদাবরী উদ্‌গস্থলে **ত্র্যম্বকেশ্বর,** মহারাষ্ট্রের ইলোরার কাছে **ঘৃষ্ণেশ্বর,** উজ্জয়িনীতে শিপ্রানদীতটে **মহাকালেশ্বর,** দক্ষিণ ভারতে সমুদ্রতটে **রামেশ্বর,** ভাগ্যনগরের কাছে শ্রীশৈলমে **মল্লিকার্জুন,** মান্ধাতাপর্বতে নর্মদাতটে **ওঙ্কারেশ্বর** ও মহারাষ্ট্রের ভীমা নদীর উৎপত্তিস্থলে **ভীমাশঙ্কর।**

দ্বাদশতম জ্যোতির্লিঙ্গ বিষয়ে দুইটি মতভেদ দেখা যায়। প্রধানত, **দেওঘরের বৈদ্যনাথ** দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্তর্গত। কিন্তু অনেকে মনে করেন মহারাষ্ট্রে **পারলির বৈদ্যনাথ** বা **বৈজনাথ** দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্তর্গত। আবার অনেকের মতে মহারাষ্ট্রের ঔন্ড্রাতে বিদ্যমান **নাগনাথ** দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্তর্গত। এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গই বর্তমানে শিবপীঠরূপে প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের জন্য এই মন্দিরগুলিতে আসেন।

এছাড়াও দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত **একম্বরেশ্বর** (পৃথিবী), **জম্বুকেশ্বর** (জল), **অরুণাচলেশ্বর** (অগ্নি), **কালহস্তীশ্বর** (বায়ু) ও **নটরাজ** (আকাশ)— এই পাঁচটি শিবমন্দির পঞ্চভূত স্থল রূপে প্রসিদ্ধ। প্রত্যেকটি মন্দির পঞ্চমহাভূতের এক একটির প্রতীক। এগুলির মধ্যে কালহস্তীশ্বর মন্দিরটি অন্ধ্রপ্রদেশে, বাকিগুলি তামিলনাড়ুতে। উল্লেখ্য, এই পাঁচটি মন্দির ভৌগোলিক ভাবে একটি সরলরেখায় অবস্থিত। হাজার হাজার বছর আগে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রযুক্তির প্রাক্কালে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত মন্দিরগুলির এরকম অবস্থান ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ বিজ্ঞানচর্চার প্রমাণ। একই সঙ্গে মহাদেবের সঙ্গে সৃষ্টিবিজ্ঞানের ক্ষীণ যোগসূত্রেরও প্রতীক।

অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত **অমররাম, দ্রক্ষরাম, সোমরাম, ক্ষীররাম** ও **ভীমরাম**— এই পাঁচটি শিবমন্দির পঞ্চরামক্ষেত্র রূপে পরিচিত। কিংবদন্তী অনুসারে, তারকাসুর একটি বিশেষ শিবলিঙ্গের উপাসনার মাধ্যমে অপ্রতিহত শক্তি অর্জন করত। পরে শিবপুত্র কার্তিক শিবলিঙ্গকে পাঁচ খণ্ডে ভেঙে ফেলেন এবং তারকাসুরকে বধ করেন। পরবর্তীকালে এই পাঁচটি খণ্ডই পাঁচটি ক্ষেত্রে পূজিত হয়। তারকাসুর পূজিত শিবলিঙ্গ কি কোনো বিশেষ ধরনের কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক শক্তির উৎস ছিল? এই কথা জানার আজ আর কোনো উপায় নেই।

উপরোক্ত মন্দিরগুলি ছাড়াও ভারতে অজস্র ঐতিহাসিক শিবমন্দির প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন— **অমরনাথ** (জম্মু-কাশ্মীর), **লিঙ্গরাজ** (ভুবনেশ্বর), **পশুপতিনাথ** (কাঠমাণ্ডু), **মুন্নেশ্বর** (শ্রীলঙ্কা) **বডক্কুনাথন** (ত্রিশূর),

আদিযোগী (তামিলনাড়ু) প্রভৃতি। কালপ্রবাহে ভারতের এই শিবময়তা সীমানা পেরিয়ে বহির্ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় **প্রাম্বানান** মন্দির, মরিশাসে বিশালাকৃতি **শিবমূর্তি,** অস্ট্রেলিয়ায় **শিববিষ্ণু** মন্দির, আমেরিকা ও ইউরোপে নানা শিবমন্দির তার সাক্ষ্য বহন করছে। বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রদের মধ্যে অন্যতম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **হীরা-মানিক জ্বলে** উপন্যাসে এই শৈব সভ্যতা প্রসারের অনুপম বর্ণনা করেছেন। বঙ্গের অন্যতম প্রধান শিবক্ষেত্র **তারকেশ্বর** ছাড়াও বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমানের বিস্তীর্ণ এলাকায় বহু প্রাচীন শিবমন্দিরের নিদর্শন মেলে।

ব্রত, উপাসনা ও বিশেষ পূজা : বছরের বিভিন্ন সময়ে ভক্তরা শিবের আরাধনায় ব্রতী হন। প্রত্যেক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিকে শিবচতুর্দশী বলা হয়। কিন্তু বিশেষভাবে ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে **মহাশিবরাত্রি** বা শিবচতুর্দশী পালিত হয়। লোকবিশ্বাস অনুসারে, এইদিন শিব ও পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। এই বিষয়ে আরও অনেক কিংবদন্তী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। লিঙ্গপুরাণ অনুসারে, প্রজাপিতা ব্রহ্মা ও ভগবান বিষ্ণু এইদিন প্রথমবার শিবের আরাধনা করেছিলেন। সোমবার শিবপূজার প্রশস্ত দিন রূপে বিবেচিত হয়। তাই ভক্তরা প্রত্যেক সোমবার দুধ, জল, পঞ্চামৃত প্রভৃতি দ্বারা শিবলিঙ্গের অভিষেক করেন। বিশেষ করে শ্রাবণমাসের সোমবার সারা ভারত জুড়ে ভক্তরা উপবাস করে শিবপূজা করে থাকেন। এছাড়াও মনস্কামনা পূরণের জন্য পরপর ষোলোটি সোমবার শিবের আরাধনা করার লৌকিক আচার কুমারী মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

অনেকে প্রতিমাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে সূর্যাস্তের সময় শিব ও পার্বতীকে অর্ঘ্য উৎসর্গ করে **প্রদোষ ব্রত** পালন করেন। বঙ্গপ্রদেশে ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চৈত্রমাসের সংক্রান্তি থেকে নববর্ষের প্রথম দু-তিন দিন ধরে মহাসমারোহে শিবের আরাধনা করা হয়। পূজার আগের দিন চড়ক গাছ ধুয়ে জলভরা পাত্রে প্রতীকী শিবলিঙ্গ রাখা হয়। শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন এই পূজার একটি বিশেষ অঙ্গ। অনেকেই সম্পূর্ণ চৈত্র মাস ইন্দ্রিয় সংযম করেন এবং মাধুকরী (ভিক্ষা করে) করে জীবন ধারণ করেন। এক মাসব্যাপী ব্রত শেষ হয় **চড়ক পূজা** বা নীলপূজা বা শিবের গাজনের মধ্য দিয়ে।

অবতারগ্রহণ : শিবপুরাণে শিবের ১৯ জন অবতারের বর্ণনা রয়েছে। আবার কূর্মপুরাণে ও লিঙ্গপুরাণে ২৮ জন রুদ্রাবতারের উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে ত্রেতাযুগে রামভক্ত পবননন্দন হনুমান অন্যতম। এছাড়া দুর্বাসা, অশ্বত্থামা প্রভৃতিও শিবাবতার রূপে বর্ণিত হয়েছেন। কলিযুগে অদ্বৈতবেদান্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ভগবান শঙ্করাচার্য শিবের অংশ। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। কামারপুকুরে যুগীদের শিবমন্দির থেকে বেরিয়ে আসা জ্যোতিই চন্দ্রমণি দেবীর গর্ভে স্থান লাভ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বীরেশ্বর শিব থেকে আবির্ভূত। সারদা দেবী রামেশ্বরে শিবের অভিষেকের সময় নিজেকে সীতা বলে স্মরণ করেছিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী মহারাজ, যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ, যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় ছিলেন সাক্ষাৎ চলমান শিব। এছাড়াও কালে কালে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে বিবিধ প্রয়োজনে শিবের অবতার গ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী পাপমুক্ত জীব শিবে পরিণত হয়।

সম্প্রদায় ও দর্শন : যারা শিবকে সর্বোচ্চ সত্তা মনে করে তাঁর উপাসনা করেন তাদের শৈব বলা হয়। শৈবসম্প্রদায় বা শৈবমত ভারত, নেপাল ও শ্রীলঙ্কাতে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। বৈদিক রুদ্র উপাসনায় এই শৈবমতের বীজ নিহিত। পাশুপত হলো প্রাচীনতম শৈব সম্প্রদায়। কালে কালে আরও অনেক শৈব সম্প্রদায় বিকাশ লাভ করেছে। তাদের মধ্যে **কাশ্মীরীয় শৈবদর্শন** বা প্রত্যাভিজ্ঞা দর্শন বা ত্রিক দর্শন সর্বাধিক জনপ্রিয়। এটি মূলত অদ্বৈততাত্ত্বিক দর্শন। এই দর্শন মতে, শিব ও আত্মা অভিন্ন। অর্থাৎ আমরা সকলেই শিবের সঙ্গে সংযুক্ত। দক্ষিণভারতে কর্ণাটকে **বীরশিবদর্শন** বা লিঙ্গায়ত দর্শন অধিক প্রসিদ্ধ। এরা গলায় একটি ছোট্ট লিঙ্গ পরিধান করেন। এই লিঙ্গ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করে। এদের মতে, শিব স্বর্গের কোনো দেবতা নন। তিনি তাদের নিত্যসঙ্গী, জীবনের পথপ্রদর্শক। এই লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়েরই প্রধান মঠ কাশীর জঙ্গমবাড়ি।

তামিলনাড়ুতে আবার **শৈবসিদ্ধান্ত** খানিক ভিন্ন মত পোষণ করে। এখানে পশু (জীবাত্মা) পতি (শিব) থেকে ভিন্ন। কিন্তু আত্মা সর্বদা শিবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করছে।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি : আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক জগতের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগতেও শিবতত্ত্ব প্রাসঙ্গিক। মাণ্ডুক্যোপনিষদে 'শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে' এই মন্ত্রে ব্রহ্ম অর্থে শিব শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দও বারবার 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-র কথা বলেছেন। যেমন আমরা মন্দিরে গিয়ে শিবের পূজা করি তেমনই জীবকে শিবস্বরূপ মনে করে জীবের সেবা করতে হবে। এখানে সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন বা আত্মদর্শনই স্বামীজীর বিবক্ষিত। তাই কেবল শিবময় ভারত নয়, জীবশিবময়রূপে জগতের দর্শনই সকলের কাঙ্ক্ষিত হওয়া উচিত।

যেই শিব সেই জীব যেই জীব সেই শিব।

শিবভিন্ন নহে জীব যথা জলে বিম্বভেদ।

(লেখক রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত দর্শন বিভাগের গবেষক)

মূর্খকে উপদেশ দেওয়া ঠিক নয়

এক গভীর জঙ্গলে একটি নারকেলগাছে অনেক পাখির সঙ্গে দুটি বাবুই পাখি বাসা বেঁধে থাকত। বেশ আনন্দে তাদের দিন কেটে যাচ্ছিল।

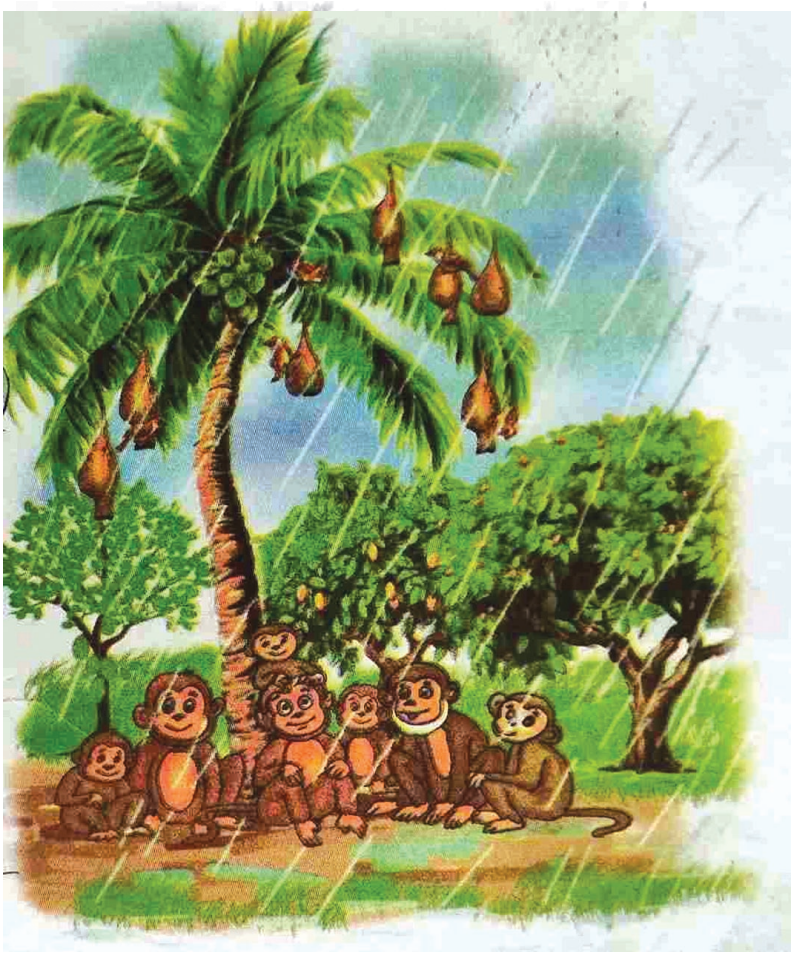

তখন শীতকাল। হঠাৎ একদিন আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গিয়ে বৃষ্টি শুরু হলো। যেন বর্ষাকাল। সেই সঙ্গে কনকনে বাতাস বইছে। ওই দুর্যোগে খাবারের সন্ধানে বেরুতে পারল না কেউ।

ঠিক সেই সময়ে এক দল বাঁদর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সেই নারকেলগাছের তলায় এসে বসল। বেচারা বাঁদররা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঠকঠক করে কাঁপছে। দাঁতে দাঁতে লেগে যাবে বুঝি।

গাছের উপরে বাবুই-বউ তার বাসায় বসে ওই বাঁদরদের দুর্দশা দেখে গলা বাড়িয়ে বলল— ও ভাই বাঁদর, শুনতে পাচ্ছো? তোমাদের কি বাড়িঘর নেই? এই শীতে জলে ভিজে ঠকঠক করে কাঁপছো। বাসা তৈরি করতেই তো পারো! তাহলে এত কষ্ট করতে হয় না। দেখছি, মানুষের মতোই তোমাদের হাত-পা রয়েছে। চেহারাও অনেকটা সেই রকম। তবু তোমরা এত কষ্ট ভোগ করছো কেন?

বাবুই-গিন্নির কথা শুনে বাঁদরগুলো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল— কে রে তুই, আমাদের এত জ্ঞান দিচ্ছিস? পুঁচকে এক পাখির তো সাহস কম নয়! আমরা কী করি না করি তা নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কীসের?

বাবুই-বউ বলল— আহা-হা, চটছো কেন? তোমাদের অমন ভিজে একশা হতে দেখে বড়ো মায়া হলো। তাই বললাম, বাসা তৈরি করলে তো এত কষ্ট ভোগ করতে হতো না। অথচ দেখো, আমরা একরত্তি পাখি হয়েও কেমন সুন্দর বাসা বেঁধেছি। বৃষ্টিতে ভিজতে হয় না, রোদে পুড়তে হয় না, শীতের হাওয়াও আমাদের কাবু করতে পারে না। কেমন আরামে আছি।

এতগুলি কথা শুনে বাঁদের দল রাগে চিড়বিড়িয়ে উঠল। এক লাফে সব বাঁদর ওই গাছে উঠে পড়ল। তারপর গাছের ডালপালা ধরে একে একে সব পাখির বাসা ভেঙে ফেলে দিতে লাগল। ছানা ও ডিমগুলোকেও বাদ দিল না।

বেগতিক দেখে পাখিরা উড়ে গিয়ে অন্য গাছে আশ্রয় নিয়েছিল তাই তারা রক্ষা পেল।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

সুলতানপুর ন্যাশনাল পার্ক

হরিয়ানার গুরুগ্রাম জেলার সুলতানপুর ন্যাশনাল পার্ক একটি বিখ্যাত পক্ষী অভয়ারণ্য। এটি নতুন দিল্লি থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এর আয়তন ১.৪২ বর্গকিলোমিটার। এখানে সাইবেরিয়ান ক্রেন, গ্রেটার ফ্লেমিংগো, রোজি পেলিকান-সহ নানা প্রজাতির পাখির আবাসস্থল। এছাড়াও এখানে নীলগাই, কৃষ্ণসার হরিণ এবং বিভিন্ন রকমের সরীসৃপ রয়েছে। উদ্যানের ভেতরে একটি বড়ো লেক রয়েছে, তাতে শীতকালে পরিযায়ী পাখিরা আসে। পাখি দেখার জন্য এখানে ৪টি ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে। রয়েছে একটি এডুকেশনাল ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার এবং ড. সেলিম আলি মিউজিয়াম। এই উদ্যান পরিদর্শনের উপযুক্ত সময় হলো অক্টোবর থেকে মার্চ মাস।

এসো সংস্কৃত শিখি-১০০

পঞ্চমী বিভক্তি: (ভাগ: - ৩)

ভারতত: -ভারত থেকে।
গ্রামত: -গ্রাম থেকে।
কলিকাতাত: - কলকাতা থেকে।
দেহলীত: - দিল্লি থেকে।
ঢাকাত: - ঢাকা থেকে।
পিতা কার্যালয়ত: আগচ্ছতি।
বাবা কার্যালয় থেকে আসছেন।
অভ্যাসং কুর্ম: -
মন্ত্রী দহেলীত: আগচ্ছতি।
সেবিকা পাকশালাত: গচ্ছতি।
কর্মচারী বিত্তকোষত: আগচ্ছতি।
রমেশ: বাটিকাত: নির্গচ্ছতি।
কৃষক: কৃষিক্ষেত্রত: আগচ্ছতি।
(এভাবে আমরা **গমন** ক্রিয়াপদ দ্বারা স্থানের নামে **ত:** যুক্ত করে বাক্য রচনা করবো)।

ভালো কথা

আমার বনভোজনের অভিজ্ঞতা

জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখে আমি বাবা-মায়ের সঙ্গে একটি বনভোজনে গিয়েছিলাম। শিয়ালদা থেকে বজবজ স্টেশনে নেমে লঞ্চে করে ওপারে বাউরিয়া জুট মিলের গেস্ট হাউসে। ঢোকার মুখে দেখলাম পাট দিয়ে নানা ধরনের জিনেস তৈরি করা চলেছে। বনভোজনের স্থানটি খুবই সুন্দর। গঙ্গার একেবারে ধারে। গঙ্গায় বড়ো বড়ো জাহাজ যাওয়া-আসা করতে দেখলাম। সবুজ মাঠ। নানাধরনের ফুলগাছে ফুল ফুটে রয়েছে। দোলনায় বসে আমরা দোল খেলাম ও ছবি তুললাম। তারপর সকালের খাবার খেয়ে সবার পরিচয়ের পর আমরা নানা রকমের খেলায় মেতে উঠলাম। খেলাগুলিতে খুব আনন্দ পেয়েছি। জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজার এসেছিলেন। তিনি জুট মিলের কথা এবং পাট থেকে কী কী তৈরি হয় তার কথা বললেন। তারপর অন্ত্যাক্ষরী, গান, আবৃত্তি হলো। দুপুরের খাবার খেয়ে এক সঙ্গে বসে শান্তিমন্ত্র বলে আমরা বাড়ির পথে রওনা হলাম। আমার এই বনভোজন খুব ভালো লেগেছে।

অগ্নিদীপ্তা চক্রবর্তী, ষষ্ঠ শ্রেণী, দেশবন্ধুনগর, বাগুইআটি,কল-৫৯।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

পুতুল বিয়ে

রিদ্ধিমা শাসমল, অষ্টমশ্রেণী, আরামবাগ, হুগলী।

বর আসছে টোপর মাথায়
আজকে পুতুল বিয়ে,
লুচি সুজি রাঁধছে খুকু
খেতে দেবে গিয়ে।
ঘোমটা মাথায় করবে বরণ
বরের বন্ধু এলে,
থালা ভর্তি মিষ্টি এনে
দেবে পাতে ঢেলে।
লাল টুকটুকে বেনারসি
চওড়া সিঁদুর পরে,
বর পুতুলের ঘরে যাবে
সংসার নেবে গড়ে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

শিবত্ব লাভই ভারতের সাধনা

ড. রামানুজ গোস্বামী

''তব তত্ত্বং ন জানামি কৃদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽলি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ।।''

—''হে মহেশ্বর, তোমার মহিমাময় যে তত্ত্ব, তা আমি কিছুই জানি না। তুমি কেমন, তা আমার জানা নেই। তাই তুমি যেই রূপ বা যেমন, তোমাকে সেই রূপেই প্রণাম জানাই।'' দেবাদিদেব প্রসঙ্গে একটি বহুল প্রচলিত উক্তি হলো— 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'। অর্থাৎ এই মহাবিশ্বের যা কিছু সত্য ও শাশ্বত, তাই হলেন শিব। অন্যদিকে যা কিছু শিব, তা সবই সুন্দর। তাই 'শিব' অর্থে জগতের যাবতীয় পবিত্র, মঙ্গলময় ও কল্যাণকর বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে। শিব তাই জগতের সর্বাঙ্গীণ পবিত্রতার প্রতীক। অনন্তকাল ধরেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরম করুণাময় শিবের উপাসনা হয়ে এসেছে। তবে যে বিশেষ দেশটিতে শিবের আরাধনা প্রথম শুরু হয়েছিল এবং সেখান থেকে তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, তা হলো শ্রীভগবানের সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান এই ভারতভূমি তথা ভারতবর্ষ। বস্তুত, মানবসভ্যতার ধাত্রীভূমি এই ভারত অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের মতো শিবোপাসনার ক্ষেত্রেও বিশ্ববাসীকে পথ দেখিয়েছে, শিবতত্ত্ব প্রসঙ্গে মানুষকে করেছে অবগত। তাই নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, পৃথিবীতে কোনো ভূখণ্ডকে যদি শিবক্ষেত্র বা শিবভূমি নামে অভিহিত করতে হয়, তবে তা হলো পুণ্যভূমি ভারত।

ঠিক কবে থেকে যে ভারতে শিবপূজার প্রচলন হয়েছিল, তা সঠিকভাবে বলা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ, সনাতনধর্ম তথা হিন্দুধর্ম এতই প্রাচীন যে, এর বয়স তথা প্রাচীনত্ব সঠিক ভাবে নির্ণয় করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। পৃথিবীতে বর্তমানে প্রচলিত ও অতীতে প্রচলিত ছিল, এমন সমস্ত ধর্ম ও মত-পথের মধ্যে সনাতন ধর্মই হলো প্রাচীনতম। এই সনাতন ধর্মের প্রধান আকর তথা ভিত্তি হলো বেদ, যা পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে পরিচিত ও স্বীকৃত। বেদে রয়েছে রুদ্র তথা শিবের প্রসঙ্গ। বিভিন্ন বেদ ও উপনিষদে আছে রুদ্র প্রশস্তি। এই রুদ্র একদিকে যেমন মহা উগ্র ও ভয়ঙ্কর, অন্যদিকে তিনি পরম করুণাময়। পাশাপাশি বিভিন্ন পুরাণেও মহাদেব শিবের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থেও ভক্তবৎসল আশুতোষ অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। বৈদিক ধারার পাশাপাশি তন্ত্রশাস্ত্রেও শিবের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিব হলেন তন্ত্রের আদি গুরু তথা তন্ত্রপ্রণেতা। এসব কথা উল্লেখ করবার কারণ এটাই যে, হিন্দুধর্মের চিরন্তন প্রবহমানতায় শিব হলেন অন্যতম সর্বোচ্চ মহিমান্বিত দেবতা। তিনি ত্রিদেবের অন্যতম। তাই আসমুদ্রহিমাচলে তাঁর উপস্থিতি সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী। কাশ্মীর থেকে

কন্যাকুমারিকা, সুদূর কৈলাস পর্বত থেকে মহাসমুদ্র— সর্বত্রই নানাভাবে বিরাজমান ভোলানাথ মহেশ্বর। কোথাও তিনি জ্যোতির্লিঙ্গ, আবার কোথাও-বা তুষারলিঙ্গ রূপে ভক্তদের কৃপাপ্রদান করে চলেছেন। কোনো স্থানে তিনি হয়তো জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে প্রকাশিত, কোথাও দর্শন পাওয়া যায় স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের। আবার কোথাও-বা তাঁর উৎপত্তি ও লয় উভয়ই হয়ে থাকে প্রাকৃতিক ভাবেই। বস্তুত, ভারতের এমন কোনো অঞ্চল দেখা যাবে না, যেখানে কোনো শিবলিঙ্গ বিরাজমান নেই অথবা কোনো শিবমন্দির নেই। সুউচ্চ প্রাসাদতুল্য মন্দিরই হোক কিংবা কোনো গাছতলায় স্থাপিত ছোট্ট শিবমন্দিরই হোক, শিবলিঙ্গের দর্শন মেলে সর্বত্রই। যে দেশের অলিতে-গলিতে শিবমন্দির লক্ষ্য করা যায়, তা যে অবশ্যই শিবক্ষেত্র, তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই দেশের আকাশে-বাতাসে শিবভক্তির পরম পবিত্র ও মাধুর্যমণ্ডিত সুর ধ্বনিত হয়। এটাই হলো ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও পরম্পরা যা এক জন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কত সাধু-সন্ন্যাসী, মহাপুরুষের আবির্ভাবধন্য এই ভারত চিরদিনই এক ধর্মভূমি।

এদেশে ধর্মের স্থান সর্বোপরি আর তা মানুষের চেতনার সকল স্তরকেই প্রভাবিত করেছে। নৈতিকতার দিক থেকে হিন্দুরা যে অন্যান্য সমস্ত মত ও পথের অনুসারীদের থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থান করে, একথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই, একমাত্র সনাতনধর্মই বলতে পেরেছে যে— 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' আর ঠিক এই কারণেই হিন্দুরা চিরদিনই বেদান্তের অনুসরণে জীবের মধ্যে শিবকে উপলব্ধি করেছে। শিবকে যথার্থভাবে পূজা করবার জন্যই তো 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' করবার কথা বলা হয়েছে। বস্তুত, এই মহান দেশের প্রাচীন ঋষিরা এই শাশ্বত সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই সমুদয় জগৎ-সংসারই হলো পরমেশ্বর শিবের এক বিরাট প্রকাশ। শিবমন্দিরে যেমন শিববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তেমন দেবালয়ের বাইরে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, সমস্ত প্রাণী, এমনকী প্রত্যেক জড় পদার্থের মধ্যেও সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিহিত আছে। এটাই হলো আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম স্তর যা কেবলমাত্র সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। তাই পৌত্তলিকতা- বিরোধীদের কাছে যা নিছকই মাটি, ধাতু বা পাথরের টুকরো মাত্র, ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে তা পরম পবিত্র শিবলিঙ্গ এবং নিঃসন্দেহেই আরাধ্য দেবতার বিগ্রহস্বরূপ, এই বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশই নেই।

ভারতের কণায় কণায় মিশে আছে শিবতত্ত্বের অনুশীলন। তাই সনাতন ধর্ম শিবের মতো দেবত্বকেই জীবনে আদর্শ রূপে বরণ করবার কথা বলা হয়েছে। লোকায়ত জীবন থেকে শুরু করে আধুনিক কালের নাগরিক সমাজ ব্যবস্থাতেও মেয়েরা শিবের মতো স্বামী লাভের জন্য প্রার্থনা করে থাকেন। শিব একাধারে যেমন আদর্শ গৃহী, অন্যদিকে তেমনই পরমজ্ঞানী, অতুলনীয় দানী এবং অবশ্যই মহাযোগী মহেশ্বর। যোগ ও ভোগ, ধর্ম ও অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই সকল পুরুষার্থের সুন্দর ভারসাম্যই হলো প্রাচীন ভারতের শিক্ষা। দেবাদিদেবের মহিমায় এই সকল বিষয়ই সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তাই পৃথিবীর প্রাচীনত সভ্য দেশ এই ভারতে ধনী-নির্ধন, জাতি-বর্ণ, আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে ধার্মিক হিন্দু ব্যক্তি মাত্রেই পরম শিবভক্ত হয়ে থাকেন। আজও ভারতের বহু মানুষ দিনের শুরুতে শিবপূজা না করে জলপানটুকুও করেন না। এদেশের অগণিত মানুষ আজও পবিত্র গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা নিত্য শিবলিঙ্গ গড়ে পূজার্চনা করে থাকেন। আসলে, ভারতীয় সমাজ আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগ-তপস্যাধৃত জীবনচর্যাকে সবার উপরে স্থান দিয়েছে। অধ্যাত্মচিন্তন তথা দেবতার সেবা প্রভৃতি ভারতবাসী তথা হিন্দুদের দুর্বলতা নয়; এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে হিন্দুত্বের শক্তি, যা যুগে যুগে অন্যায়, অত্যাচার, বিধর্মীদের দ্বারা ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে সহায়তা করেছে। বারে বারে বহিরাগত বিধর্মীরা একের পর এক মন্দির ধ্বংস করেছে, অগণিত মানুষকে হত্যা করেছে নির্মমভাবে কিন্তু হিন্দুধর্মকে বিনষ্ট করা সম্ভব হয়নি কখনো।

হিন্দুদের ধৈর্য, বীরত্ব, ত্যাগস্বীকার ও ঈশ্বরের প্রতি অবিচল আস্থা পুনরায় গড়ে তুলেছে নতুন ভব্য দেবমন্দির। একথা মনে রাখতে হবে যে, শিবের উপাসনা নিছকই কবির কল্পনা মাত্র নয়। ভক্তবৎসল মহাদেব ভক্তদের শক্তিপ্রদান করেন। ভক্তি যখন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তখন তা হয়ে ওঠে অদম্য। এই ভাবেই ঐক্যবদ্ধ হিন্দুসমাজ একের পর এক বহিরাগত আঘাতকে প্রতিহত করেছে। আমরা যদি গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের কথা ভাবি, তবে এই সত্য সহজেই অনুভব করতে পারব। বহিরাগত বর্বর বিধর্মী দস্যুর দল বারে বারে এই পবিত্র মন্দিরে আক্রমণ করেছে, দেবালয়কে করেছে কলুষিত ও বিধ্বস্ত। কিন্তু এখানেই ইতিহাস থেমে থাকেনি। অত্যাচারীদের পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে হিন্দুরা— গড়ে উঠেছে জ্যোতির্লিঙ্গ সোমনাথের ভব্য মন্দির। এর জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে অসংখ্য মানুষকে, করতে হয়েছে আত্মবলিদানও। প্রকৃতপক্ষে, এটাই শিবক্ষেত্র ভারতের প্রকৃত স্বরূপ, আর এই কারণেই ভারতীয় সভ্যতাই হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মধ্যে একমাত্র জীবিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

শিবভূমি ভারতের কথা বলতে গিয়ে শিবপুরী কাশীর কথা তো অবশ্যই বলা দরকার। মোক্ষ প্রদানকারী নগরী কাশীকে বলা হয় ভারতের আধ্যাত্মিক রাজধানী। এখানে স্বমহিমায় বিরাজ করছেন জ্যোতির্লিঙ্গ বাবা বিশ্বনাথ। এই মহান নগরীও রেহাই পায়নি বিধর্মী আক্রমণকারীদের হাত থেকে। কিন্তু দমিয়ে রাখা যায়নি হিন্দুদের। গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেকটা জল, আক্রমণকারীদের লেশমাত্র চিহ্নও আজ নেই— কিন্তু দেশ-বিদেশের অগণিত হিন্দুর শ্রদ্ধা-ভক্তির ধারক, বাহক হয়ে আজও একইভাবেই ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন বাবা বিশ্বনাথ। শিবময় কাশী তথা বারাণসীতে তাই এই কথা বলা হয়ে থাকে যে— 'কাশীকা হর এক কঙ্কর, হ্যায় ভোলা শঙ্কর'।

কেদারনাথ থেকে রামেশ্বরম্, সোমনাথ থেকে বৈদ্যনাথধাম— শিবের সর্বাধিক প্রিয় এই দেশের সাহিত্যে, সংগীতে, বিনোদনে, লোকায়ত গল্পগাথায় অর্থাৎ এককথায় সর্বত্রই বিরাজ করছেন যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেব। তাঁর কাছে নেই কোনো ভেদাভেদ, তিনি সকলেরই প্রিয়। কোনো স্থানে তিনি বৈদ্যশ্রেষ্ঠ রূপে পূজিত, আবার কোথাও-বা সাধু ও ধার্মিক ব্যক্তিদের রক্ষক ও অসুরবিনাশকারী ভৈরব রূপে বিরাজমান। তাই তো মহাশিবরাত্রি তিথিতে কিংবা পবিত্র শ্রাবণ মাসে শিবময় ভারত মুখরিত হয়ে ওঠে 'হর হর মহাদেব' ধ্বনিতে। এই কারণেই তো চৈত্র মাসে সন্ন্যাসীদের কঠোর ত্যাগব্রতে মানুষ পরমাত্মার কৃপালাভে কৃতার্থ হয়।

শিবত্ব লাভই হলো শিবময় ভারতের সাধনা। এই সাধনাই ভারতকে অদ্বিতীয় করে তুলেছে। শাশ্বত, সনাতন ধর্মের এই মন্ত্রে দীক্ষিত হোক সমস্ত ধর্মপ্রাণ হিন্দু। □

দলে দলে মাওবাদী আত্মসমর্পণ করছে

দুর্গাপদ ঘোষ

ছত্তিশগড়ের জগদলপুরে আয়োজিত 'বস্তার অলিম্পিকে'র সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গত ১৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা মাওবাদীদের 'বিষাক্ত সাপের মতো' বলে মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, এইসব অতিবামেরা উন্নয়নের পথে একটা বড়ো বাধা। তিনি সেদিন আবারও একবার ঘোষণা করেন যে ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশকে 'মাওবাদমুক্ত' করা হবে। নির্ধারিত সেই সময় বলতে গেলে নাকের ডগায়। তার মধ্যে ভারতকে মাওবাদী কমিউনিস্টদের কবলমুক্ত করা যাবে কিনা সেটা সময় বলবে। কারণ পাহাড়ঘেরা এবং গভীর জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে সশস্ত্র উগ্রবাদীদের দমন করা গেলেও শহরে-নগরে, সভ্য সমাজের মূলস্রোতে মিশে থেকে যাঁরা প্রচ্ছন্নভাবে এদের সমর্থন করে যাচ্ছেন, যুক্তি খাড়া করে পিছন থেকে মদত দিয়ে যাচ্ছেন, সরকারি অভিযান ও নানা প্রকল্পকে 'মানবাধিকার লঙ্ঘন'-এর ধুঁয়ো তুলে গলাবাজি করে চলেছেন, সংবিধান গেল গেল বলে আইনি কূটকচালির রাজনীতি গরম করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত দেশকে পুরোপুরি 'মাওবাদমুক্ত' করা যাবে কিনা তা এক কথায় লাখ টাকার প্রশ্ন। বিষাক্ত গাছের জঙ্গল কেটে বা ছেঁটে আপাতদৃষ্টিতে জমি পরিষ্কার করা যায়। কিন্তু সেই জমির অভ্যন্তরে যদি তার শিকড় কিংবা বীজ থেকে যায় তাহলে একদিন মাটি ফুঁড়ে সেইসব মাথাচাড়া দিতে পারে। তবে যারা গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে, প্রশিক্ষণ নিয়ে হত্যার রাজনীতি করে সমান্তরাল প্রশাসন কায়েম করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে তাদের নির্মূল করার জন্য বর্তমান কেন্দ্র সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে যেকোনোও শান্তিপ্রিয় ও উন্নয়নকামী মানুষের কাছে তা যে আন্তরিকভাবে গ্রাহ্য ও সমর্থনযোগ্য এ নিয়ে মতান্তরের অবকাশ নেই।

২০১৪ সালে ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী এবং একাধিক রাজ্যে বিজেপি-র সরকার এ পর্যন্ত যা যা বলেছে বা ঘোষণা করেছে, তা সময়মতো করেছে এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। এক্ষেত্রেও আশা করা যেতে পারে যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণামতো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সশস্ত্র মাওবাদীদের নিহত অথবা গ্রেপ্তার কিংবা আত্মসমর্পণ করিয়ে সমাজের মূলস্রোতে নিয়ে এসে দেশকে মাওবাদমুক্ত করতে পারবে। আর শহুরে মাওবাদী বা 'আরবান মাও'-দের সম্পর্কে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটা পরে ভাবা যাবে। ইদানীংকালে সরকারের মাওবাদী-বিরোধী অভিযান তথা তাদের বিরুদ্ধে সাম, দাম ও দণ্ড নীতি এবং তার রূপায়ণের কার্যকারিতার ফলে মাওবাদীরা যে হারে দলে দলে আত্মসমর্পণ করছে, আটক হচ্ছে, নিহত হচ্ছে এবং যে পরিমাণে গ্রামের পর গ্রাম, এলাকার পর এলাকা মাওবাদী শূন্য হচ্ছে তাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা আশান্বিত হচ্ছেন। বিগত সাড়ে পাঁচ দশকে যার কিয়দংশও সম্ভব হয়নি, বর্তমান সরকারের ইচ্ছাশক্তির জোরে গত দু' আড়াই বছরের মধ্যে তা কার্যকরী হবার সম্ভাবনায় পৌঁছে গেছে।

বর্তমানে অনেকের ধারণা, প্রায় ৫৮ বছর আগে উত্তরবঙ্গ থেকে গজিয়ে উঠলেও এখন মাওবাদীদের ঘাঁটি কেবল ছত্তিশগড়েই কেন্দ্রীভূত। এটা সম্পূর্ণ অমূলক। ১৯৬৭ সালের ১৮ মে একজন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী তথা শহুরে উগ্র বামমার্গী চারু মজুমদারের উসকানিতে এবং কানু স্যান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতালের হিংসাত্মক ভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যন্ত গ্রাম নকশালবাড়ি থেকে এই সন্ত্রাসবাদীদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সামনে ছিল চীনের চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙের একনায়কতান্ত্রিক 'বিপ্লবী আদর্শ'-এর মাধ্যমে সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানো। ক্রমে সেই তথাকথিত বিপ্লব তথা হিংসাশ্রয়ী হত্যার রাজনীতির অনুগামীদের বিস্তৃতি ঘটে

নেপাল থেকে বিহার হয়ে ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গনা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ হয়ে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত। ভারতের মানচিত্রে লাল দাগের একটা রেখা টানলে মোটামুটি ইংরেজি এস অক্ষরের মতো এদের বিস্তৃতি। এজন্য এক সময় মাওবাদী প্রভাবিত এলাকাকে কেউ কেউ 'এস ক্যাকটার' বলতেন। বেশিরভাগ মানুষ অবশ্য 'রেড করিডোর' বলে জানেন। তবে গত কয়েক বছর যাবৎ মুখ্যত ছত্তিশগড়ে সবচাইতে বেশি সক্রিয়।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেও মাওবাদীরা সবচাইতে শক্ত ঘাঁটি গড়ে অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশে বিশেষ করে ওয়ারাঙ্গল (এখন তেলেঙ্গনায়) এলাকায়। ২০০০-এ দশকের প্রথম দিকে সেখানে এদের উপদ্রব মাত্রাছাড়া হয়ে ওঠে। রাজ্যের তৎকালীন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুগুরি সানদিনতি রাজশেখর রেড্ডি (ওয়াই এস আর রেড্ডি)-র সরকার অতিষ্ঠ হয়ে দলের হাইকমান্ডের তোয়াক্কা না করে কড়া পদক্ষেপে নামে। তখন নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে মাওবাদীদের একটা বড়ো অংশ গিয়ে ঘাঁটি করে ২০০০ সালের ১ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশ ভেঙে নবগঠিত ছত্তিশগড়ের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকাগুলোতে। বিশেষ করে বস্তার বিভাগের অন্তর্গত ৭ জেলা যথা কাঞ্জের, কোণ্ডাগাঁও, বস্তার, সুকমা, বীজাপুর, নারায়ণপুর ও দান্তেওয়াড়ায়। এবং অচিরেই যথারীতি সশস্ত্র হামলা চালাতে থাকে। জেলাগুলোর মুখ্যত জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামবাসীদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে, বন্দুকের নলের মুখে তাদের দলে দলে যোগদান ও সমর্থন করতে বাধ্য করতে থাকে। ওই রাজ্যে তখন ছিল কংগ্রেসের অজিত যোগী সরকার। তাঁর জমানায় ওই রাজ্যের অনেক এলাকায় খনিজ পদার্থ ব্যবসায়ীদের অপরহরণ করে মোটা টাকা মুক্তিপণ আদায়, জঙ্গলের দামি দামি গাছ কেটে এবং পাহাড়ি এলকার খনিজ সম্পদ লুঠ করে কালোবাজারে বিক্রি করে প্রচুর টাকা জোগাড় করে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কেনা, নিরাপত্তা বাহিনীর কনভয়ের ওপর হামলা চালিয়ে জওয়ানদের হত্যা করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়া, বিদেশি বাজার থেকে শক্তিশালী মাইন সংগ্রহ করা ইত্যাদি দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে রীতিমতো সঙ্ঘবদ্ধ সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে থাকে।

এরপর ২০০৩ সালে ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস সরকারকে পরাজিত করে রাজ্যবাসী বিজেপি-র সরকার গঠনের জন্য জনমত দেয়। ডাঃ রমণ সিংহের মুখ্যমন্ত্রিত্বে গঠিত হয় নতুন সরকার। ওই বিজেপি নেতা মুখ্যমন্ত্রী হয়েই মাওবাদ দমনে নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযান বজায় রাখার পাশাপাশি নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 'সালওয়া জুডুম' নামে গ্রামরক্ষী বাহিনী তৈরি করা। মুখ্যত জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলোর সমর্থ যুবকদের নিয়ে গঠিত হয় এই বাহিনী। তাদের হাতে সরকারি অস্ত্র তুলে দিয়ে মাওবাদ মোকাবিলার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে থাকে। তারা যেহেতু গ্রামগুলোর স্থানীয় লোক, স্থানীয় ভাষাভাষী এবং নিজেদের এলাকা সম্পর্কে অবহিত সেজন্য তাদের পক্ষে মাওবাদীদের চিহ্নিতকরণ,সুলুকসন্ধান এবং সামনাসামনি মোকাবিলা করা অনেক বেশি সহজ হয়। উপরন্তু সালওয়া জুডুমের সদস্যদের হাতে অস্ত্র থাকায় গ্রামগুলোর সাধারণ মানুষদের ভীতি দ্রুত কমে যেতে থাকে। বাড়তে থাকে মোকাবিলা করার সাহস। একটা সময় আসে যখড় স্থানীয় গ্রামবাসীরা দলে দলে এই বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য এগিয়ে আসতে থাকে। সালওয়া ডুডুমের মোকাবিলার মুখে পড়ে দুঃসাহসী মাওবাদীরা ক্রমে পিছু হঠতে শুরু করে। গ্রামে গ্রামে ফিরে আসতে থাকে অতঙ্কমুক্ত পরিবেশ। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে গ্রামের পর গ্রাম মাওবাদীদের হাতছাড়া হয়ে যায়। অনেক জায়গা থেকেই রণে ভঙ্গ দিয়ে সশস্ত্র তারা পালিয়ে যেতে থাকে। সালওয়া জুডুমের ওই মোকাবিলার সময় মাওবাদীদের হাতে বাহিনীর কোনও কোনও সদস্যর যেমন মৃত্যু ঘটে তার চাইতে অনেক বেশি হারে নিহত হতে থাকে মাওবাদীরা।

কিন্তু ডাঃ রমণ সিংহ তথা বিজেপি সরকারের এই ব্যবস্থায় গেল গেল রব তুলে রাজনীতির মাঠে নামে বিজেপি বিরোধীরা। বিশেষ করে কংগ্রেস ও মাওবাদী সমর্থক তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা। তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধুয়ো তুলে তীব্র বিরোধিতা করতে থাকে। গ্রামবাসীদের হাতে সরকারি অস্ত্র তুলে দেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়। বলতে থাকে, মাওবাদী নিয়ন্ত্রণের নামে জনজাতির লোকেদের বিরুদ্ধে বেআইনি রাজনীতি করছে রমণ সিংহ সরকার। এই শ্রেণীর মদতে কংগ্রেস এমনকী সুপ্রিম কোর্টেও যায়। জনৈক নন্দিনী সুন্দর বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য মামলায় ২০১১ সালে সর্বোচ্চ আদালত সালওয়া জুডুমকে 'অসাংবিধানিক' বলে যায় দেয়। ফলে কার্যত নিষিদ্ধ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় ওই গ্রামরক্ষী বাহিনী। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফের উগ্রমূর্তি ধারণ করে আরও বেশি মাত্রায় সন্ত্রাস চালাতে শুরু করে মাওবাদী জঙ্গিরা। জায়গায় বিশেষত সুকমা ও দান্ডেওয়াড়ায় তাদের দৌরাত্ম্য সীমা ছাড়িয়ে যায়। দু'বছর যেতে না যেতেই নিজেদের ধনিবাজি রাজনীতির কুফল ভুগতে হয় কংগ্রেসকে। ২০১৩ সালের ২৫ মে দান্তেওয়াড়ার ঝিরামঘটিতে সদলবলে কনভয় নিয়ে যাবার সময় প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লার ওপর ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটে। মর্মান্তিকভাবে আহত হয়ে ১৭ দিনের মাথায় ১১ জনের মৃত্যু হয়। মাওবাদীদের ওই প্রাণঘাতী হামলায় তাঁর ওই 'পরিবর্তন যাত্রায়' অংশ নেওয়া কংগ্রেসি নেতা-কর্মীদের মধ্যে ৩২ জন নিহত হন। যাঁর মধ্যে ছত্তিশগড় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নন্দকুমার প্যাটেল এবং রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন বিরোধী নেতা মহেন্দ্র কর্মাও ছিলেন। নিহত হয় কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীও। পিছন থেকে রমণ সিংহ সরকার বিরোধীদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন পাওয়ায় মাওবাদীরা এতখানি দুঃসাহসী হয়ে উঠলেও ২০১৮ সাল অবধি ডাঃ রমণ সিংহ সরকারের কার্যকাল পর্যন্ত আর কোনও বড়ো নেতার ওপর বড়োসড়ো কোনও হামলার ঘটনা ঘটেনি। ২০১৮ সালে ভূপেশ বাঘেলের মুখ্যমন্ত্রিত্বে কংগ্রেস ফের ক্ষমতায় বসে। তাঁর সরকার উন্নয়নমূলক কিছু কাজ করলেও মাওবাদীদের বিরুদ্ধে তেমন কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারেনি। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার অনবরত কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়ে গেলেও রাজ্যের উল্লেখিত ৭ জেলায় প্রায়ই ছোটো-বড়ো হামলার ঘটনা ঘটতে থাকে। এরপর ২০২৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর পুনরায় সরকার গঠন করে বিজেপি। বিষ্ণু দেও সাই মুখ্যমন্ত্রী হয়েই প্রাক্তন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিংহের মতো কঠোর ব্যবস্থার পাশাপাশি মাওবাদীদের আত্মসমর্পণ করিয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো 'বস্তার অলিম্পিক'-এর আয়োজন করা। এছাড়া আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের পুনর্বাসনের জন্য আকর্ষণীয় প্যাকেজও ঘোষণা করে বিজেপি সরকার। পাশাপাশি শূন্য সহ্য নীতি নিয়ে মাওবাদ দমন অভিযানকে তীব্র করা হয়। তার ফলে একদিকে যেমন নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে মাওবাদীদের মৃত্যু হতে থাকে, অন্যদিকে উল্লেখিত অসামরিক ব্যবস্থায় সশস্ত্র মাওবাদীরা অনেকে আকর্ষিত হতে থাকে। খেলাধুলোয় অংশ নিয়ে বস্তার অলিম্পিকে যোগদানের জন্য প্রশিক্ষণ

নিতে শুরু করে। এই উভয় ব্যবস্থার জন্যই শ্রী সাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র প্রেরণা, সমর্থন, সহযোগিতা ও সাহায্য পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২০২৪ সালের মে মাসে প্রথম 'মাওবাদীমুক্ত ভারত'-এর ডাক দেন। ঘোষণা করেন, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে সশস্ত্র মাওবাদীরা অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে এলে তাদের উপযুক্ত ও আকর্ষণীয় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে তা না করে যারা সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত থেকে হিংসাত্মক সন্ত্রাসের পথে হাটবে নিরাপত্তা বাহিনী তাদের নিকেশ (নিউট্রালাইজ) না করা পর্যন্ত নিরস্ত হবে না। তারপর আরও কয়েকবার তিনি একই কথা বলেছেন। বস্তুত শ্রী শা' প্রথম ঘোষণার এক বছর আগে থেকেই মোদী সরকার 'লাল সন্ত্রাস' দমনে তীব্র অভিযান শুরু করে। 'শাহ'র ওই ঘোষণার পর এবং সাম ও দাম উভয় প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসাবে দলে দলে মাওবাদী আত্মসমর্পণ করে চলেছে। অন্যদিকে নিরাপত্তা বাহিনী তীব্র অভিযানে অন্তত ১৫ জন শীর্ষনেতাসহ অনেক মাওবাদী নিহত হয়েছে এবং হচ্ছে।

সশস্ত্র মাওবাদীদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে মুখ্যত দুটি ঘটনায়। প্রথমটা ২০২৪ সালের ১৬ এপ্রিল। 'অপারেশন কাগার' নামে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে সেদিন ২৯ জন মাওবাদী নিহত হয়। দ্বিতীয়টা ঘটে ২০২৫ সালের ১৮ নভেম্বর। সেদিন নিহত হয় সারা ভারতে মাওবাদী শীর্ষনেতা মাদবি হিদমা। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এন আই এ) এবং একাধিক রাজ্য সরকারের তরফে যার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল ১ কোটি টাকা। ওই অভিযানে প্রধান ভূমিকায় ছিল 'কমান্ডো ব্যাটেলিয়ন ফর রেজোলিউট অ্যাকশন' রেজিমেন্ট। বলা বাহুল্য মাওবাদ দমন অভিযান এযাবৎকালের মধ্যে এটা ছিল সবচাইতে বড়ো সাফল্য। ৫১ বছর বয়সি হিদমা ছিল সিপিআই (মাওবাদী)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং অ্যাকশন কমিটির সর্বোচ্চ কমান্ডার। সরকারের কাছে মোস্ট ওয়ান্টেড ওই মাওবাদী নেতা দীর্ঘদিন ধরে ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গনা সীমান্ত এলাকার জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে জঙ্গি-সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছিল। এরকম একজন দুর্ধর্ষ নেতা যে নিহত হবে এটা ছিল তাদের ধারণার বাইরে। সুতরাং তারা নিহত হওয়া এবং মাল্লুজোলা বেনুগোপাল রাও ওরফে 'ভূপতি'র মতো ধুরন্ধর মাওবাদী নেতার আত্মসমর্পণে তারা একটা বিরাট ধাক্কা খেয়েছে। ভূপতি কয়েক মাস আগে ২০২৫ সালের ১৪ অক্টোবর ৬১ জন সঙ্গী-সহ মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলিতে পুলিশের কাছে গিয়ে অস্ত্র নামিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। তার আগে অপারেশন কাগার অভিযানে এক দিনে অতজন সশস্ত্র মাওবাদী নিহত হবার ঘটনাও তাদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল কেন্দ্রে মোদী এবং ছত্তিশগড়ে সাই সরকারের জমানায় তাদের শেষের দিন শুরু হয়েছে। এই 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের ঘোষণা কেবল কথার কথা নয়, রাজনীতির ফাঁকা আওয়াজ নয়। এরা যা বলে তা করে।

কেবল প্রথাগত নিরাপত্তা বাহিনী এবং 'কোবরা' কমান্ডো বাহিনীই নয়। রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় আধাসেনা বাহিনী ছাড়াও অভিযান চালাচ্ছে 'সিব' নামের অন্য একটা বাহিনী। তাদের প্রধানত মাওবাদী-বিরোধী গোয়েন্দা বাহিনী হিসাবে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে তৈরি করেছে মোদী সরকার। তারা যে অভিযান চালাচ্ছে তার নাম 'গ্রে হাউন্ড'। ওই বাহিনীর কাজ হলো গেরিলা হামলার মতো আঘাত করে সরে যাওয়া। আচমকা গুপ্ত হামলা চালানো। এই 'গ্রে হাউন্ড' অভিযানের কারণেও অনেক জায়গায় মাওবাদীদের নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে। এইভাবে নানা ধরনের ব্যবস্থায় দ্রুত পিছু ঠেলতে ঠেলতে মাওবাদীদের এখন প্রায় কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে। ২০১৪ সালের আগে সারা দেশে যেখানে ১৮ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় তাদের দাপট ছিল। সেখানে ২০২৪ সালে তা সঙ্কুচিত হয় ৪ হাজার ২০০ বর্গকিলোমিটারে। আর ২০২৫ সালে মাত্র কয়েকশ বর্গমিলোমিটারে এসে ঠেকেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে আরও জানা গেছে যে ২০১০ সালে দেশের ১২৬ টা জেলা মাওবাদীদের কবলে চলে গিয়েছিল। এখন মাত্র ১১টারও কম জেলায় সীমিত হয়েছে। বিশেষ করে ছত্তিশগড়ে ২০১৪ সালে মুখ্যত ৭টা সহ মোট ১১টা জেলায় মাওবাদীদের প্রচণ্ড দৌরাত্ম্য ছিল। ২০২৫-এ তা গণ্ডিবদ্ধ হয়েছে মাত্র ৩টে জেলায়।

বিগত প্রায় আড়াই দশক ধরে ছত্তিশগড় ছিল মাওবাদীদের সবচাইতে বড়ো ঘাঁটি। বিশেষ করে দক্ষিণ বস্তার এলাকা। যার মধ্যে সুকমা ও দান্তেওয়াড়া রয়েছে। প্রাক্তন রমণ সিংহ সরকার নানা ব্যবস্থা নিলেও বিভিন্ন মহল থেকে অনবরত বাধা আসার কারণে তাঁর সরকারের পক্ষে যতটা সাফল্য লাভের সম্ভাবনা ছিল তা সম্ভব হয়নি। ২০২৩-এ বিষ্ণু দেও সাই সরকারের আমলে মাওবাদীরা তাদের পায়ের তলার মাটি হারাতে হারাতে এখন প্রায় খাদের কিনারায় এসে ঠেঁকেছে। ছত্তিশগড় সরকারের এক রিপোর্ট মোতাবেক মাওবাদীদের ৮৫ শতাংশেরও বেশি ক্যাডার কমে গেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান গুলোতে কেবল হিদমা নয়, তার আগে ২০২৫ সালের ২১ মে নিহত হয় সিপিআই (মাওবাদী)-এর সাধারণ সম্পাদক নামবাল্য কেশব রাও 'বাসবরাজু'। তার নিহত হবার পর থেকে মাওবাদীদের প্রধান লড়াকু বাহিনী 'পিপল্‌স্ লিবারেশন গেরিলা আর্মি' (পিএলজিএ)-র কাজকর্মের পরিকাঠামো প্রায় ভেঙে পড়তে থাকে। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল পিএলজিএ ব্যাটেলিয়নের সর্বশীর্ষ নেতা হিদমা নিহত হবার পর সেটুকুও বলতে গেলে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত, মাওবাদীদের মোকাবিলায় ডাঃ রমণ সিংহ সরকারের তৈরি করা 'সালওয়া জুডুম' একটা দারুণ কার্যকরী প্রকল্প ছিল। বর্তমান বিষ্ণু দেও সাই সরকারের 'বস্তার অলিম্পিক' প্রকল্প মাওবাদীদের অস্ত্র ছেড়ে মূলস্রোতে ফিরে আসার ক্ষেত্রে খুবই আকর্ষণীয় ভূমিকা পালন করছে। দফায় দফায় এবং দলে দলে আত্মসমর্পণ করা যুবক-যুবতীরা নানা ধরনের খেলাধুলোর দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে আরও বড়ো সুসংবাদ হলো, আত্মসমর্পণ করে এই ক্রীড়া প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হবার সুবাদে এক সময়ে তীব্র ভারত-বিরোধী মাওবাদীদের অনেকে জাতীয়তাবোধেও উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। সাই সরকার এই 'অলিম্পিক' শুরু করে ২০২৪ সালের নভেম্বরে। সে বছর আনুমানিক ৩০০ জনের মতো আত্মসমর্পিত মাওবাদী তাতে অংশ নিয়েছিল। ২০২৫ সালে সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে গেছে। ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী স্টেডিয়ামে তার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। স্থানীয় ভাষায় 'নয়া বাত' অর্থাৎ 'নতুন পথ' গ্রহণ করা আত্মসমর্পিত মাওবাদীদের মধ্যে এবারের বস্তার অলিম্পিক দৌড়, হাই জাম্প, লং জ্যাম্প, কবাডি, তিরন্দাজি ইত্যাদিতে ৭০০ জনেরও বেশি প্রাক্তন মাওবাদী অংশগ্রহণ করে। তাদের অনেকেই শীর্ষস্থানে থেকে পুরস্কারও জিতে নিয়েছে। 'লাল সেলাম' স্লোগান ছেড়ে অনেককে 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি দিতেও শোনা গেছে।

উচ্চশিক্ষা যখন বেকারত্বের শংসাপত্র

পশ্চিমবঙ্গের তরুণ প্রজন্মের অন্তহীন রক্তক্ষরণ

সোমনাথ গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষটি এক চরম নৈরাজ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক দেউলিয়াপনার স্মারক হিসেবে খোদিত থাকবে। দীর্ঘ টালবাহানা ও প্রশাসনিক অদূরদর্শিতার পর রাজ্য সরকার যখন 'সেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিশন পোর্টাল' বা কেন্দ্রীয় অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল, তখন আশা করা হয়েছিল যে গত বছরের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে এই ব্যবস্থা অন্তত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল এক মর্মান্তিক ও কঙ্কালসার চিত্র। চলতি শিক্ষাবর্ষের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত একাধিক দফার কাউন্সেলিং ও 'মপ-আপ' রাউন্ডের পরেও সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলোতে শূন্য আসনের সংখ্যা ৩ লক্ষ্যের গণ্ডি অতিক্রম করেছে। খোদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলোতেই প্রায় অর্ধেক আসন আজ খাঁ খাঁ করছে। নামী সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ, যেখানে একসময় ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মেধাযুদ্ধ চলত, সেখানে আজ পড়ুয়াদের খুঁজে আনতে প্রশাসনের নাভিশ্বাস উঠছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ— জেলা স্তরের কলেজগুলোর দশা আরও শোকাবহ; মুর্শিদাবাদ বা বীরভূমের বহু কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রসংখ্যা আজ দুই অঙ্কেও পৌঁছাতে পারেনি। কেন্দ্রীয় পোর্টালে হাজার হাজার আবেদন জমা পড়লেও শেষ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসঘরে পা রাখেনি। এই গণ-অনীহা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা আজ স্রেফ আইসিইউ-তে থাকা এক মৃতপ্রায় সত্তা। উচ্চশিক্ষা আজ আর পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজের কাছে কোনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য নয়, বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী বেকারত্বের 'লাইসেন্স' এবং যন্ত্রণার মহোৎসব মাত্র। এই বিশৃঙ্খলা কেবল পোর্টালে কারিগরি ত্রুটি নয়, বরং এটি একটি গোটা সমাজ ও প্রশাসনিক কাঠামোর পচনের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

এই ক্রমবর্ধমান অনীহা এবং নিম্নগামী গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (GER)-এর মূলে রয়েছে গত দেড় দশকের তৃণমূল জমানায় ঘটে যাওয়া নজিরবিহীন ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়োগ দুর্নীতি। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিমুখ হওয়ার প্রধান কারণ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির সেই দগদগে ক্ষত, যা আজ ক্যানসারের রূপ নিয়েছে। গত ১৫ বছরে স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC), প্রাথমিক টেট (TET) এবং কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে পৈশাচিক জালিয়াতি জনসমক্ষে এসেছে, তা মেধাবী পড়ুয়াদের মেরুদণ্ড চূর্ণ করে দিয়েছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষা দপ্তরের শীর্ষ আমলাদের কারাবাস এবং এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলোর হাতে উদ্ধার হওয়া কুবেরের ধন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাসকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

> **দুর্নীতি, শিল্পহীনতা এবং নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়ার অভাব— এই তিনের বিষাক্ত সংমিশ্রণ পশ্চিমবঙ্গকে আজ এক অন্তহীন অন্ধকার খাদের কিনারে এনে দাঁড় করিয়েছে। বিশ্ব যখন আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সেমিকন্ডাক্টর বিপ্লবের পথে ধাবমান, পশ্চিমবঙ্গ তখন তার পুরনো গৌরবের কঙ্কাল বয়ে বেড়াচ্ছে।**

২০১৬-র মেধা তালিকা বাতিলের মতো ঐতিহাসিক আইনি সংঘাত বা যোগ্য প্রার্থীদের রাজপথে হাজার দিনের রোদ-বৃষ্টির কান্না--- এইসব দৃশ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জনপদকে এক প্রবল হতাশায় নিমজ্জিত করেছে। শুধু শিক্ষা নয়, নিয়োগের প্রতিটি রন্ধ্রে দুর্নীতির যে বিষবাষ্প ছড়িয়েছে, তাতে পড়ুয়াদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, হাড়ভাঙা খাটুনি করে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর হওয়ার চেয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমদান বা রাজ্যছাড়া হওয়া অনেক বেশি সম্মানজনক। যখন পড়ুয়ারা দেখে যে, অযোগ্যরাই অর্থের বিনিময়ে শিক্ষকতা করছে, তখন উচ্চশিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা চিরতরে বিলীন হয়ে যায়। এই নৈতিক ও প্রশাসনিক পতনই পশ্চিমবঙ্গের GER-কে জাতীয় গড়ের তুলনায় লজ্জাজনকভাবে নীচে ঠেলে দিয়েছে, সেখানে শিক্ষা আজ অধিকার নয়, বরং দুর্নীতির নিলামে চড়া এক পণ্য।

পরিসংখ্যানের কঠোর আয়নায় তাকালে

এই সংকটের গভীরতা আরও ভয়াবহ রূপে ধরা দেয়। ২০১২ থেকে ২০২৫— এই ১৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ থেকে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষের বেশি ছাত্র-ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডী পার করেছে। গড়ে প্রতি বছরে ৮ লক্ষের কাছাকাছি পড়ুয়া স্কুলজীবনে ইতি টেনেছে। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতীর তুলনায় সরকারি কর্মসংস্থানের চিত্রটি কার্যত মরুভূমির মতো। তথ্য বলছে, এই দেড় দশকে রাজ্যে স্থায়ী সরকারি পদে নিয়োগের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। গত ১৪ বছরে স্কুল সার্ভিস কমিশনে বড়ো মাপের নিয়োগ হয়েছে হাতে গোনা কয়েকবার, যা ক্ষুধার্তের মুখে এককণা অন্নের শামিল। স্থায়ী পদের পরিবর্তে সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ বা চুক্তিভিত্তিক 'কন্টিনজেন্ট' কর্মীদের ছড়াছড়ি রাজ্য সরকারের অন্তঃসার- শূন্যতাকেই প্রকট করে। একটি সাধারণ গাণিতিক প্রক্ষেপণ করলে দেখা যায়, গত দেড় দশকে প্রতি ১০০ জন উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়ার মধ্যে ৩ জনেরও কম শিক্ষার্থী স্থায়ী ও সম্মানজনক সরকারি চাকরি অর্জন করতে পেরেছে। এই চরম বৈষম্য ও অনিশ্চয়তা পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার বাজারকে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা যখন দেখছে যে ১০ লক্ষ উত্তীর্ণের জন্য স্থায়ী শূন্যপদ মাত্র কয়েক হাজার, তখন তারা উচ্চশিক্ষায় সময় ও মেধা ব্যয় করার বদলে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে নাম লেখানোকেই নিয়তি বলে মনে করছে এই গাণিতিক অনিশ্চয়তা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগঞ্জকে আজ ছাত্রশূন্য শ্মশানে পরিণত করেছে, যেখানে উচ্চশিক্ষা আজ কেবল এক অর্থহীন বিলাসিতা।

কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার পরিস্থিতি আরও করুণ, যা সরাসরি রাজ্যের দেউলিয়াপনাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং সিটের সংখ্যা কৃত্রিমভাবে বাড়ানো হলেও ছাত্রসংখ্যা পাল্লা দিয়ে কমেছে। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের তথ্য অনুযায়ী, ইঞ্জিনিয়ারিঙে প্রায় ১৫ হাজার আসন এবছরও শূন্য পড়ে রয়েছে। এই অন্ধকারের মধ্যেই সরকারে প্রতি বছর ঘটা করে আযোজন করে 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট' (BGBS)। সরকারি দাবি অনুযায়ী, বিগত সম্মেলনগুলিতে প্রস্তাবিত বিনেয়োগে কাল্পনিক অঙ্ক ১৫ লক্ষ কোটি টাকা ছড়িয়েছে। অথচ বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে এই আকাশচুম্বী দাবির এক শতাংশের প্রতিফলনও দৃশ্যমান নয়। যদি লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ সত্যিই আসত, তবে আজ পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর ক্যাম্পাসিং প্লেসমেন্ট রেকর্ড ভেঙে দিত। কিন্তু ক্যাম্পাসিঙের এই কঙ্কালসার দশা রাজ্য সরকারের নজিরবিহীন দ্বিচারিতাকেই প্রমাণ করে। রাজ্যে নতুন কোনো ভারী শিল্প বা আধুনিক টেকনোলজি হাব গড়ে ওঠেনি। টাটা-সিঙ্গুর পরবর্তী অধ্যায়ে যে শিল্প-মরুভূমি তেরি হয়েছিল, তা গত দেড় দশকে আরও বিস্তৃত হয়েছে। বড়ো বড়ো কর্পোরেট হাউজগুলো কলকাতা থেকে তাদের সদর দপ্তর মুম্বই বা গুরুগ্রামে সরিয়ে নিয়েছে। ফলে মেকানিক্যাল বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারীদের জন্য রাজ্যে কোনো সম্মানজনক অন্নসংস্থানের সুযোগ নেই। BGBS-এর মঞ্চে যে অলীক স্বপ্নের কথা শোনানো হয়, ল্যাবরেটরিতে বসে থাকা বেকার ইঞ্জিনিয়ারের আর্তনাদ তার সম্পূর্ণ বিপরীত। শিল্পহীনতাই আজ পশ্চিমবঙ্গের কারিগরি শিক্ষার চিতা সাজাচ্ছে।

উচ্চশিক্ষায় নথিভুক্তীকরণের চিত্র সর্বশেষ সরকারি পরিসংখ্যান (AISHE) অনুযায়ী

বিভাগ	সর্ব ভারতীয় গড় (%)	পশ্চিমবঙ্গ গড় (%)
আর্টস ও হিউম্যানিটিজ	৩৪.২	২৯.১
বিজ্ঞান	১৪.৮	১০.৫
ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি	৯.৬	৭.২
সামগ্রিক GER	২৮.৪	২৬.৩

পশ্চিমবঙ্গের এই বেকারত্ব এবং উচ্চশিক্ষার পতনের চিত্রটি যদি ভারতের প্রথম সারির রাজ্যগুলির সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের পতনের চিত্রটি আরও প্রকট হয়। স্নাতকস্তরের নথিভুক্তীকরণ বা GER-এর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে একটি ভয়াবহ সত্য সামনে আসে।

সারণী দ্রষ্টব্য ঃ

এই ব্যবধানই প্রমাণ করে যে, মহারাষ্ট্র, গুজরাট বা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলোতে উচ্চশিক্ষিতদের জন্য এক বিশাল বেসরকারি ক্ষেত্র ও শিল্পাঞ্চল বিদ্যমান। গুজরাট বা মহারাষ্ট্রে ম্যানুফ্যাক্চারিং ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় ৩.৫ গুণ বেশি। তামিলনাড়ু বা তেলেঙ্গানায় সামগ্রিক GER যেখানে ৫০ শতাংশের দোরগোড়ায়, সেখানে ২৬.৩ শতাংশে ধুঁকছে পশ্চিমবঙ্গ। কারণ সেই সব রাজ্যের পড়ুয়ারা জানে যে ডিগ্রির পর সেখানে রুটিরুজির অভাব নেই। এমনকি উত্তরপ্রদেশ বা হরিয়ানার মতো রাজ্য যেখানে গত এক দশকে প্রচুর নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ তৈরি করছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ কেবল মেলা, খেলা আর সরকারি খয়রাতির 'পপুলিজম' সংস্কৃতিতেই মজে থেকেছে।

দুর্নীতি, শিল্পহীনতা এবং নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়ার অভাব— এই তিনের বিষাক্ত সংমিশ্রণ পশ্চিমবঙ্গকে আজ এক অন্তহীন অন্ধকার খাদের কিনারে এনে দাঁড় করিয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, বিশ্ব যখন আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সেমিকন্ডাক্টর বিপ্লবের পথে ধাবমান, পশ্চিমবঙ্গ তখন তার পুরনো গৌরবের কঙ্কাল বয়ে বেড়াচ্ছে। যদি অবিলম্বে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ এবং নিয়োগে ১০০ শতাংশ স্বচ্ছতা না আসে, তবে এরাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা অচিরেই ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে এবং এই মেধাশূন্য রাজ্যটি কেবল ভারতের সস্তা শ্রমিকের আড়তদার হিসেবেই পরিচিতি পাবে। পশ্চিমবঙ্গের সামনে সময় ফুরিয়ে আসছে, আর এই নীরব রক্তক্ষরণ বন্ধ না হলে আগামী প্রজন্মের অভিশাপ থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৬১)

প্রজ্ঞা প্রভাব

কথায় বলে 'দূরের ঘাস সবুজ' অর্থাৎ দূর থেকে সবুজ মনে হলেও কাছে গেলে তার আসল চেহারা চোখে পড়ে। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই, নেতাদের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই। জেলে ডাক্তারজীর সম্পর্কে সকলের পক্ষে এরকম ভাবাটাই স্বাভাবিক ছিল। তারা ভেবেছিলেন চন্দ্রে তো কলঙ্ক আছে, অতএব ডাক্তারজীর মধ্যে অহঙ্কার, সুবিধাবাদী, তাচ্ছিল্যবোধের মতো কলঙ্ক নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু ডাক্তারজীর ক্ষেত্রে হলো ভিন্ন। যারাই তাঁর কাছে এলেন, দেখলেন— অদ্ভুত দেশভক্তি, অনুপম ধ্যেয়নিষ্ঠা, সততা, ত্যাগ ও আত্মীয়তাবোধের এক উজ্জ্বল চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তিনি। আর সেই ব্যক্তিত্বের কারণে দেখা গেল, কারাগার অধ্যক্ষ শ্রীপাণ্ডেও বেশ প্রভাবিত হয়েছেন। ডাক্তারজীর লক্ষ্য, আদর্শ ও কার্যপদ্ধতির কথা নানান সময়ে কথায় কথায় তিনিও শুনতেন। শ্রীপাণ্ডে ধীরে ধীরে বেশ ডাক্তারজীর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, আর এই নিকট সম্পর্ক এতটা ঘনিষ্ঠ হলেন যে ডাক্তারজীর কাছে এসে তিনি নিজের সংসারের কথাবার্তাও বলতে লাগলেন। শ্রী পাণ্ডের একটি বিবাহযোগ্য কন্যা ছিল এবং তিনি তার জন্য বেশ চিন্তিত ছিলেন। ডাক্তারজী সে কথা জানতে পেরে তার কোষ্ঠী দেখে কয়েকজন সুপাত্রের সন্ধান তাঁকে দিলেন। নিজের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছেও ডাক্তারজী এই কোষ্ঠী পাঠিয়ে দিলেন। নাগপুর থেকে সঙ্ঘ শাখা বিষয়ক তথ্যাদি জানাবার জন্য ডাঃ পরাঞ্জপে, কখনো ভাউরাও কুলকর্ণী ডাক্তারজীর সঙ্গে জেলে দেখা করতে আসতেন। তখন ভাউরাও কেবল সদ্য স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছেন। ডাক্তারজী তার কথা শ্রী পাণ্ডেকে বললেন। তার ফল হলো শ্রী ভাউরাও যখনই আসতেন বেশ কিছুক্ষণ ডাক্তারজীর সঙ্গে কথা আলোচনার সুযোগ পেতেন, এটা ডাক্তারজীর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার মধ্যেই ছিল। তবে জেল থেকে বাইরে আসার পরও ডাক্তারজী শ্রীপাণ্ডের কন্যার জন্য পাত্রী খোঁজার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন।

কারাপ্রধানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় ডাক্তারজী তো যেকোনো সুবিধা নিতে পারেন, অন্যান্য বন্দিদের তাই ধারণা ছিল। ডাক্তারজীকে তারা এ ব্যাপারে অনেকবার অনুরোধও করেছেন কিন্তু ডাক্তারজী কখনো সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে কোনো সুবিধা নিতে রাজি হননি। একবার 'বি' শ্রেণীর বন্দিদের ভেজাল ঘি খাওয়ানো হচ্ছে বলে কয়েকজন ডাক্তারজীকে জানালেন এবং শ্রী পাণ্ডেকে বিষয়টা জানাতে বললেন। একটু বেশি আগ্রহ করলে ডাক্তারজী তাদের বললেন— 'আমার এটা দ্বিতীয় কারাবাস। শত্রুপক্ষের কাছে কিছু প্রার্থনা করা আর সে দয়া করে আমাদের কিছু দেবে সেটা আমার ভালো লাগবে না। অফিসারদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো, সেই কারণে তারা আমার কথা শুনবেন ঠিকই কিন্তু আমি দুঃখিত, আমি এরকম করতে পারবো না'।

(৬২)

কাশীতে সঙ্ঘমন্ত্র

ডাক্তারজীর পরম মিত্রস্থানীয় শ্রীবাবারাও সাভারকর ডাক্তারজীকে কাশী আসার জন্য এক জরুরি বার্তা পাঠালেন। আসলে ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চের দিকে কাশীতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার একটা আশঙ্কা দেখা দিলে হিন্দুদের মধ্যে আত্মরক্ষার সামর্থ্য, সাহস, সংগঠন এবং সর্বোপরি তাদের একটু জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই ছিল এই আহ্বান। এই সময় বাবারাও কিছুটা অসুস্থ, ছোটাছুটি খুব সম্ভব ছিল না, কেবল বন্ধু না, বলা যায় সময়ের আহ্বানে ডাক্তারজী ১১ মার্চ পৌঁছে গেলেন বাবা বিশ্বনাথক্ষেত্র কাশীতে। ১ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন। ডাক্তারজী তাঁর স্বভাবসুলভ পদ্ধতিতেই শুরু করেন নিরন্তর সম্পর্ক বৈঠক ও যোজনা। ইতিমধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন। যদিও তাঁর সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নাগপুর সঙ্ঘশাখায় হয়েছিল। কিন্তু এবার মালব্যজীর সহমতিতে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও কাশী নগরে ডাক্তারজী একটি করে শাখা শুরু করেন।

২৬ মার্চের পত্রে ডাক্তারজীর কাশীতে এই প্রথম সঙ্ঘশাখার শুভ সূচনার কথা জানা যায়। এ ধরনের নিরন্তর কর্মযোজনায় দাঙ্গার পরিবেশে হিন্দুদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হলো, সঙ্গে সঙ্ঘ-চিন্তা সকলের মধ্যে প্রসার লাভ করতে লাগলো। একদিন এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের বৈঠক শেষে ডাক্তারজী সকলকে অনুরোধ করেন প্রতিজ্ঞা গ্রহণের, যাতে তিনি 'তন-মন-ধন-পূর্বক আজীবন কাজ করব' এই বাক্যটি প্রয়োগ করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন সজ্জন 'তন মন ধন' -এর পরিবর্তে 'যথাসাধ্য' শব্দ প্রয়োগের পরামর্শ দিলে ডাক্তার সকলকে ব্যাখ্যা করে বোঝান— 'যথাসাধ্য' সামান্য একটু করে, কিছু না করেও বলা যেতে পারে, কিন্তু দেশমাতৃকার কাজে পূর্ণ সমর্পণ চাই। তাই আমি আমার শরীর, মন, অর্থ, সব দিয়ে দেশের কাজ করবো— এই ভাব আসা চাই। বাবারাও সাভারকর ডাক্তারজীর নিঃস্বার্থ দেশভক্তি, ধ্যেয়বোধ ও একাগ্রতার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি নিজেও ইতিপূর্বে হিন্দু তরুণদের একটি সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'তরুণ হিন্দু মহাসভার' স্থাপনা করেছিলেন, কিন্তু লক্ষ্য করলেন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের অনুশাসন, সংস্কার, দেশাত্মবোধের সঙ্গে এদের পার্থক্য অনেক। তাঁর এই অসমর্থ-শরীরে বিরাট কিছু করার আত্মবিশ্বাসও যেন কমে গিয়েছিল। সেই কর্মদক্ষতা, গতিশীলতা, উদ্যমের সঙ্গে শুধুমাত্র ডাক্তারজীর পক্ষেই সংগঠন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তাই তিনি একদিন ডাক্তারজীর সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে বলতে প্রকাশ করে ফেললেন তার মনের কথা— 'ডাক্তার, আজ আমি আমার 'তরুণ হিন্দু মহাসভার' বিসর্জন করছি, আপনি একে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। এরপরে আমার যতটুকু শক্তি আছে তা আমি সঙ্ঘকার্যেই ব্যয় করব'। ডাক্তারজী আপ্লুত হলেন বাবাসাহেবের প্রস্তাবে, কারণ তিনি তখন অনুভব করছিলেন নিজ সৃষ্ট সংস্থার প্রতি কোনোরকম আত্মাভিমান না রেখে শুধু ধ্যেয় পথে লক্ষ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এমন ত্যাগ সত্যি বিরল। সংগঠনের এটাই মন্ত্র এটাই শক্তি।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস